চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে তৃতীয় অন্যতম ধারা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা। ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ় বঙ্গের কাব্য। ধর্মপূজা, ধর্মঠাকুরের প্রভাব, ধর্মমঙ্গল কাব্য ও তার প্রচার সকলই রাঢ়বঙ্গের বিষয়। রাঢ়বঙ্গের কবিগণই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন এবং কাব্য প্রচারিত ছিল রাঢ়বঙ্গের মধ্যেই। ধর্মমঙ্গলের যে সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে সবগুলি পাওয়া গেছে রাঢ়বঙ্গেই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রচার ও বিস্তার সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি ছিল না।ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ়বঙ্গের জীবন কথা। রাঢ়বঙ্গের মানুষ, তার চরিত্র ধর্ম নিয়ে, যাবতীয় বিশেষত্ব নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটা লক্ষ করেই কেউ কেউ ধর্মমঙ্গলকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলতে চান। ধর্মপূজা চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত থাকলেও সম্ভবত ধর্মমঙ্গল কাব্য চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়নি। আবিষ্কৃত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি মূলত চৈতন্য-পরবর্তীকালেই রচিত বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। সুতরাং ধর্মমঙ্গলে চৈতন্য-পরবর্তীকালের সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুত মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত সমাজের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সমাজ এক নয়, তা এখানে সহজে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মমঙ্গলে অনেক বিবর্তিত-পরিবর্তিত সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে তা বলাই বাহুল্য।

ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট রূপ ও ধর্মপূজা সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব কালে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত কাব্য রচনাও চৈতন্য-পূর্ব কালেই সূত্রপাত হয়েছিল, তবে ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত যে সকল কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটিই সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব কালের রচিত নয়, তাই চৈতন্য-পরবর্তীকালের কাব্য হিসাবেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনা হয়ে থাকে। কাব্য হিসাবে ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি খুব বেশী নয়, তবে পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মমঙ্গলই প্রধান; যদিও পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রবণতা খুব বেশী দেখা যায় না, এবিষয়ে ধর্মমঙ্গল ব্যতীত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলই অন্যতম। ধর্মমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা কম হবার কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে-প্রথমত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা হলেও ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি, উত্তরে ময়ূরাক্ষী ও দক্ষিণে দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড রাঢ় অঞ্চল নামে চিহ্নিত । বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া. পুরুলিয়া, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদের একাংশ, চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুরের একাংশ, বিহারের একাংশ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। অঞ্চলভিত্তিক হওয়ার জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মনসামঙ্গলের বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণের মত প্রথম শ্রেণীর কবির আর্বিভাব ধর্মমঙ্গলে হয়নি।

তৃতীয়ত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা মূলত স্ত্রী দেবতা, ধর্মঠাকুর পুরুষ দেবতা। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে ধীরে ধীরে নারী শক্তির উত্থান ঘটেছে, তাই মনসা ও চণ্ডী সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ধর্মঠাকুর তা পারেনি।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ঃ রাঢ়বঙ্গের আদিম অধিবাসী, যারা আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো অষ্ট্রালয়েড জাতির শাখাভুক্ত. ধর্মঠাকুর তাদের আরাধ্য দেবতা।[১] ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম' শব্দটি প্রাচীন অষ্ট্রিক 'কুর্ম' বাচক শব্দের সংস্কৃত রূপ।[২] 'কুর্ম' বাচক অষ্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে 'ধর্ম' শব্দটি সৃষ্টি।[৩] ডোম জাতি অষ্ট্রিক জাতির একটি শাখা। ধর্মঠাকুরের নামের সঙ্গে 'রায়' কথাটি যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে. ধর্মঠাকুরের নাম তাই 'কালুরায়'.

'বুড়া রায়', 'বাঁকুড়া রায়' ইত্যাদি। সম্ভবত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ডোম জাতির দেবতাকে বলত 'ডোম রায়'। 'ডোম রায়' শব্দ থেকেও 'ধর্ম' শব্দটির সৃষ্টি বলে মনে করা হয়, যেমন ডোম রায় > ডোমরা > ডোরমা > ধর্ম।[৪] কালক্রমে ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং ইসলামিক প্রভাবে মিশ্র দেবতায় পরিণত হয়। সূর্য, বরুণ, শিব, বিষ্ণু, যম ইত্যাদি নানা রূপে পূজারীগণ ধর্মঠাকুরের ধ্যান করে থাকে। তা সত্ত্বেও ধর্মঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-ই সর্ব প্রথম ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ধর্মদেবের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। তিনি আরো জানিয়েছেন ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ।[৫] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও এই মতের সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালেও ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, আরো বিভিন্ন পণ্ডিতগণ গবেষণা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন- ধর্মঠাকুর প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেবতার লৌকিক রূপ। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

প্রথমত ঃ ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় লৌকিক সূর্যদেবের প্রভাব আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ করে বলা যায়, ধর্মপূজার সঙ্গে সূর্যপূজার ভাবনাগত মিল আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কখনো বৌদ্ধ প্রভাব এবং কখনো পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে ধর্মদেব কখনো বুদ্ধ, কখনো শিব, কখনো বিষ্ণুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য এই একীকরণ সম্পূর্ণ বহিরাঙ্গিক বিষয় হয়েই থেকেছে।

তৃতীয়ত ঃ ধর্মঠাকুর সম্ভবত ডোম সম্প্রদায়ের রণদেবতা, অন্তত ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠে এই ধারণা জন্মায়। এর সঙ্গে অবশ্য আদিম প্রস্তর পূজা, প্রতীক পূজা, প্রজনন শক্তির উপাসনা এবং নানা গ্রামীণ সংস্কার ও গ্রাম দেবতার ভাবনা মিলে ধর্মদেবের অবয়ব তৈরী। ধর্মঠাকুর যে পৌরাণিক দেবতা নয়, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ধর্মঠাকুর ডোম সমাজের দেবতা, ডোম পুরোহিতের দ্বারাই পূজিত। তার পূজা পদ্ধতিও লৌকিক অর্থাৎ পৌরাণিক বিধিসম্মত নয়। মনসা, চণ্ডীর মত লৌকিক দেবতা হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মদেব সমাজের উচ্চ কোটিতে স্থান পায়নি। ধর্মঠাকুর মিশ্র দেবতারূপেই স্থান পেয়েছে, পৌরাণিকীকরণের প্রচেষ্টা হলেও তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নেই। ধর্মদেবের প্রতীক রূপে একখণ্ড শিলা পূজিত হয়। অবশ্য প্রতীক পূজা হিন্দুসমাজে নতুন নয়, শালগ্রাম শিলা কিংবা শিবলিঙ্গ প্রতীকের দৃষ্টান্ত। শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গের মত ধর্ম শিলার কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। গোলাকার, ডিম্বাকার, চৌকাকার, কোথাও বা কূর্মাকৃতি, কোথাও বা কাঁকড়া বিছের মত আকৃতি বিশিষ্ট শিলাখণ্ড পূজা করা হয়। পাথরের গায়ে পিতলের পেরেক বা কাচের টুকরো লাগিয়ে চোখ তৈরী করা হয়। সাধারণত পণ্ডিত উপাধিধারী ডোম পুরোহিতরা ধর্মঠাকুরের পূজক হলেও ব্রাহ্মণ পুরোহিত কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। প্রজনন শক্তি বা উর্বরতা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই অনাবৃষ্টির সময়ে বর্ষণ কামনায়, দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনায়, মৃতবৎসা রমণী সন্তানের আরোগ্য কামনায় ধর্ম ঠাকুরের কাছে মানৎ করে, পূজা দেয়। হাঁস, মুরগী, শূকর, ছাগল বলি দেওয়া ধর্ম পূজার অঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের অন্ত্যজ ডোম জাতির জীবনাচারের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কিত আচার-আচরণের নিবিড় যোগ রয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন কোন গ্রন্থে শুধু মাত্র হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। যেমন, যদুনাথের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ।আবার কোন কোন গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র পালার সঙ্গে লাউসেনের পালা স্থান লাভ করেছে। কালক্রমে হরিশ্চন্দ্র পালার কাহিনী নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়েছে এবং লাউসেনের কাহিনীই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী খানিকটা সংক্ষিপ্ত ও পুরাণ কেন্দ্রিক এবং এটিই ধর্মমঙ্গলের মূল আখ্যানভাগ বলে অনুমিত হয়। কাহিনীটি নিম্নরূপঃ

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তার স্ত্রী মদনা নিঃসন্তান ছিল; একারণে লোকসমাজে তারা নিন্দনীয় ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং রানী মদনা মনের দুঃখে রাজধানী পরিত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে উপস্থিত হয়। তারা সেখানে দেখে ধর্মঠাকুরের ভক্তেরা ঘটা করে ধর্মপূজা করছে। রাজা ও রানী তাদের কাছে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা শুনে ধর্মপূজা করে পুত্র বর লাভ করে এবং এতে শর্ত হয় যে, পুত্র লাভ করলে রাজারানী পুত্রকে ধর্মদেবের কাছে বলি দেবে। রাজারানী এই শর্তে রাজী হয় এবং রানী মদনা যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। পুত্রের নাম রাখা হয় লুইধর বা লুইচন্দ্র। এদিকে পুত্রের মুখ দেখে রাজারানী তাদের শর্তের কথা ভুলে গেল। বালক লুইচন্দ্র একদিন বাটুলের আঘাতে ধর্মঠাকুরের বাহন উলুককে আহত করে, উলুক শ্রীধর্মদেবের কাছে তার দুরবস্থার কথা নিবেদন করে। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজারানীর কাছে উপস্থিত হয়ে লুইচন্দ্রের মাংস দিয়ে একাদশীর পারণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাজারানী দুঃখ পেলেও শেষ পর্যন্ত লুইচন্দ্রকে কেটে মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খেতে দেয়। ধর্মঠাকুর হরিশচন্দ্র ও মদনার সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে লুইচন্দ্রকে পুনরায় জীবিত করে দেয়। এভাবে রাজারানীর প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হয়। প্রথম কাহিনী এখানেই শেষ। পণ্ডিতগণ মনে করেন লাউসেনের কাহিনী রাঢ়বঙ্গের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এই কাহিনীর নায়ক লাউসেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত পূজা প্রচারের প্রয়োজনে দেবসভার নর্তকী জাম্বুবতীকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যলোকে নিয়ে আসা হয়। রমতি নগরের বেন রায়ের স্ত্রীর গর্ভে জাম্বুবতী জন্মগ্রহণ করে রঞ্জাবতী নামে। রঞ্জাবতী মহামদের ভগিনী এবং গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা। গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ছিল ঢেকুরগড়ের অধিপতি। রাজকর প্রদানকে কেন্দ্র করে ইছাই ঘোষ ঢেকুরগড় আক্রমণ করে এবং কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে হত্যা করে ঢেকুরগড় জয় করে নেয়। পুত্রের মৃত্যুতে কর্ণসেনের স্ত্রী আত্মহত্যা করে এবং পুত্রবধূরা সহমরণে গমন করে। বৃদ্ধ কর্ণসেনের দুরবস্থার কথা ভেবে গৌড়েশ্বর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেয় এবং ময়নাগড়ের অধিপতি করে পাঠায়। রঞ্জাবতীর দাদা মহামদ গৌড়েশ্বরের পাত্র। সে এই বিবাহে সম্মত ছিল না। তার অজান্তে বিবাহ হওয়ায় মহামদ ভগ্নী ও ভগ্নীপতির প্রতি রুষ্ট হয়ে শত্রুতা করে, এবং 'আঁটকুড়া' (অপুত্রক) বলে গালিগালাজ করতে থাকে। রঞ্জাবতী অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে পুত্র কামনায় কঠোর কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে দিয়ে ধর্মঠাকুরের ব্রত পালন করে এবং ধর্মদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্র বর দেয়। যথাসময়ে রঞ্জাবতী এক পুত্রসন্তান প্রসব করে, তার নাম লাউসেন।এদিকে মহামদ নানা ভাবে বালক লাউসেনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন সুরক্ষিত থাকে এবং রঞ্জাবতী আরো একটি পুত্র লাভ করে , তার নাম হয় কর্পূর। লাউসেন বড় হয়ে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এরপর লাউসেন ও কর্পূর গৌড়েশ্বরের রাজসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে কামদল বাঘকে হত্যা করে, জালন্দার গড়ে কুম্ভীর বধ করে এবং সুরিক্ষা নটীর অহঙ্কার খর্ব করে গৌড়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখানে মাতুল মহামদের ষড়যন্ত্রে লাউসেনকে কারারুদ্ধ করা হয়। লাউসেন বীরত্ব প্রদর্শন করে কারামুক্ত হয় এবং গৌড়েশ্বরের পুরস্কার লাভ করে দেশে ফিরে আসে। পথে কালু ডোমের সঙ্গে মিত্রতা হয় এবং কালু লাউসেনের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করে। এদিকে মহামদ লাউসেনকে হত্যা করার নতুন নতুন ছক কষতে থাকে। প্রথমে কামরূপরাজের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠানো হয়। লাউসেন কামরূপরাজকে পরাস্ত করে তার কন্যা কলিঙ্গাকে লাভ করে; এরপর শিমূলরাজ হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার কন্যা কানড়াকে লাভ করে। মহামদ মহাশক্তিশালী ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠায় সেখানে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হয়। মহামদ শেষ পর্যন্ত গৌড়েশ্বরকে দিয়ে আদেশ দেয় যে লাউসেন সূর্যের পশ্চিমোদয় ঘটাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। লাউসেন হাকন্দে ধর্মদেবের কঠোর সাধনায় মগ্ন হয়। এদিকে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করে। কালু ডোম, লখ্যা ডোমনী, শাখা-সুখা ও কলিঙ্গা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। আর লাউসেনের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্মদেব সূর্যের পশ্চিম উদয়ের অনুমতি দেয়। ধর্মঠাকুরের

কৃপায় সকলেই পুনর্জীবন লাভ করে আর মহামদের কুষ্ঠরোগ হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মহামদ লাউসেনের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে। এইভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হল। লাউসেন পুত্র চিত্রসেনের হাতে ময়নাগড়ের দায়িত্ব অর্পণ করে স্বর্গারোহণ করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ধর্মমঙ্গল কাব্যে কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়—

প্রথমতঃ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বিশিষ্টতা, ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা, কানড়া, লখাই ডোমনীর বীরত্ব কথা স্মরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ ডোম সৈন্যদের বীরগাথা ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল বিষয়।

তৃতীয়তঃ পাল রাজাদের ইতিহাস বিশ্রুত কোন গৌরবময় কাহিনী ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে লুকিয়ে আছে।

চতুর্থতঃ করুণ রস নয়, বীর রসই ধর্মমঙ্গলের অঙ্গীরস, এদিক থেকে কাব্যে মহাকাব্যের স্বাদ আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা কে, তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সংশয় রয়েছে। রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্মপূজা বিধান এবং শূন্যপুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম পূজার কথা আছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ কাব্যের আদি কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের কথা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তত চব্বিশ জন কবির কথা পাওয়া যায়, এদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলীই অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য কবিগণের মধ্যে শ্যাম পণ্ডিত, খেলারাম চক্রবর্তী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক প্রমুখ কবিগণ প্রখ্যাত। অনেকে অবশ্য শ্যাম পণ্ডিতকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলে মনে করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে ময়ূরভট্টকে। ধর্মমঙ্গলে পরবর্তীকালের কবিদের অনেকেই ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবির মর্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।যেমন-

১। ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমান হৃদ
দ্বিজ রূপরাম রসগান॥(রূপরাম/১০)

২। 'ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।" (ঘনরাম/১০)

কিংবা— "ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়। (ঐ/৭৯)

ধর্মদেব মানিকরাম গাঙ্গুলীকে ময়ূরভট্টের কথা শুনিয়েছে—

"আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন ॥
বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ॥ (মানিকরাম/২৩)

ময়ূরভট্ট 'হাকন্দপুরাণ' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ,দুর্ভাগ্যবশত ময়ূরভট্টের হাকন্দ পুরাণের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ' গ্রন্থটির প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে পণ্ডিতের মত। ডঃ সুকুমার সেন সংস্কৃত সূর্যশতক প্রণেতা ময়ূরভট্ট ও ধর্মমঙ্গল রচয়িতা ময়ূরভট্টকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।[৬] বাস্তবে ময়ূরভট্টের নামটি ছাড়া আলোচনার তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই, তবে তাঁর কাব্য কীর্তি লুপ্ত তাও নয়, কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিরা তাঁর নাম স্মরণ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের কাব্যের পুথি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করলেও গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' গ্রন্থটিকে ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা বলে মনে করেন।[৭] তিনি আরো জানিয়েছেন ময়ূরভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের সমসাময়িক।[৮] কথিত আছে ময়ূরভট্ট কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সূর্যবন্দনা করে সূর্যশতক

কাব্য রচনা করলে কুষ্ঠরোগ মুক্ত হন। কারো কারো মতে ময়ূরভট্ট চৈতন্য-পূর্ব যুগসন্ধি কালের কবি।[৯] ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলে অনুমান করেছেন এবং ১১৭৯/১১৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের মানুষ বলে মনে করেছেন।[১০] কেউ কেউ খেলারাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন এই মত সমর্থন করেন না।[১১] তবে তাঁদের কাব্যেরও কোন পুথি পাওয়া যায়নি, সবটাই রাঢ়বঙ্গে প্রচারিত কিংবদন্তীর মত।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ ডঃ সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সন -তারিখ যুক্ত প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং তিনিই প্রথম কবি, যাঁর কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়েছে। অনেকে আদি রূপরাম বলে আরেক জন রূপরামের কথা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্য—"যতদূর জানা যায় তাহাতে তাঁহার আগে লেখা আর কোন ধর্মমঙ্গল পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গল রচয়িতা-অনেকেই তাঁহাকে 'আদি রূপরাম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"[১২] রূপরাম চক্রবর্তীই সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে পরিপূর্ণ কাব্যে পরিণত করেন। রূপরাম চক্রবর্তী কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয় পাঠে জানা যায় কবির নিবাস বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর-

"অনেক দিবস বাড়ী কাইতি শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর।" (রূপরাম/৭)

কবির পিতা পরম পণ্ডিত ছিলেন। কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দময়ন্তী। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কবি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন এবং বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর কবির বিদ্যালাভ ও ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভের কাহিনী। কবি শেষ পর্যন্ত গোয়ালা ভূমের রাজা গণেশ রায়ের আনুকূল্য লাভ করেন এবং কাব্য রচনা করেন। রূপরামের কাব্য রচনার কাল নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে কাব্যে উল্লিখিত কালজ্ঞাপক শ্লোকের সাহায্যে—

"শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপর রস তায় রস দেহ।
এই শাকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ।(ঐ/৩৬৮)

পয়ারটির আবার পাঠান্তর আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কবি প্রদত্ত কাল নির্ণায়ক শ্লোক অনুসারে স্থির করেছেন রূপরামের কাব্য রচনাকাল ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৩] আবার ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ১৫৭১ শকাব্দ বা (১৫৭১+৭৮) ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।[১৪] রূপরামের কাব্যে শাজাহান পুত্র শাহাজাদা সুজার উল্লেখ আছে—

"রাজমহলের অঙ্কে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে তার বৈসে যত প্রজা॥" (ঐ/৯)

সুতরাং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দকেই যুক্তিসঙ্গত কাল বলে ধরা হয়ে থাকে।

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য পালাভিত্তিক রচনা। সমগ্র কাব্যটি সর্বমোট ২৫টি পালায় রচিত।যথা-

(১) বন্দনা পালা (২) স্থাপনা পালা (৩) আদ্যঢেকুর পালা (৪) রঞ্জারবিভা পালা (৫) হরিশ্চন্দ্র পালা (৬) শালেভর পালা (৭) লাউসেন জন্ম পালা (৮) লাউসেন চুরি পালা (৯) আখড়া পালা (১০) ফলানির্মাণ পালা (১১) মল্লবধ পালা (১২) বাঘজন্ম পালা (১৩) বাঘবধ পালা (১৪) জামতি পালা (১৫) গোলাহাট পালা (১৬) হস্তীবধ পালা (১৭) কাঙুরযাত্রা পালা (১৮) কলিঙ্গাবিভা পালা (১৯) লৌহগণ্ডার পালা (২০) কানড়াবিভা পালা (২১) অনুমৃতা পালা (২২) ইছাই বধ পালা (২৩) অঘোর বাদল পালা (২৪) জাগরণ পালা (২৫) স্বর্গারোহণ পালা।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্ব প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ঘনরাম কাব্যে অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মত আত্মপরিচয় বর্ণনা করেননি। বন্দনা অংশের পর কবি সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। কবির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় কবি প্রদত্ত ভণিতা অংশগুলি থেকে। কবি বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—

"কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।" (ঘনরাম/৬৮৬)

বিভিন্ন ভণিতায় কবি তাঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা য়ায় কবির পিতামহ ধনঞ্জয়, পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা দেবী—

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥" (ঐ/৭০)

সম্ভবত ঘনরাম বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্যে বিভিন্ন ভণিতায় রাজার মঙ্গল কামনা করেছেন। কাব্যে ঘনরাম বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ করলেও কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অবশ্য জানা যায় না। কীর্তিচন্দ্রের আদেশেই যে কবি কাব্য রচনা করেছেন একথাও জানা যায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—সম্ভবত ঘনরাম কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা ছিলেন এবং হয়ত ব্যক্তিগত কোন কারণে ঘনরাম কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা উপকৃত ছিলেন বলেই কীর্তিচন্দ্রের নাম কাব্যের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।[১৫] ঘনরাম কাব্যে আরেক জনের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন কবির গুরুদেব। সম্ভবত তাঁর নাম শ্রীরাম দাস। বিভিন্ন ভণিতায় কবি গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন—

১। "গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
নূতন মঙ্গল রস গান।" (ঐ/১৩৭)

২। "রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।" (ঐ/১৩২)

এই রামচন্দ্র সম্ভবত কবির গুরুদেব। ঘনরাম এই গুরুর আদেশেই কাব্যরচনা করেন এবং গুরুই কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কাব্যের সর্বত্রই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে শ্রদ্ধাবনত, তাছাড়াও তাঁর কাব্যে রামায়ণের সুপ্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঘনরামের কাব্যের নাম 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'; বিভিন্ন ভণিতায় কবি ঐ নাম ব্যবহার করেছেন—

"চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥" (ঐ/৩৫০)

অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি 'অনাদিমঙ্গল' বা 'অনাদ্যমঙ্গল' এই নাম ব্যবহার করেছেন—

"গায় দ্বিজ ঘনরাম অনাদিমঙ্গল।
পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল॥" (ঐ/১৪০)

ঘনরাম আরবী, ফারসী ভাষায় পাঠগ্রহণ করেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্য বৈদগ্ধের ছাপ সুস্পষ্ট। ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি তিনি। কাব্যের শেষে কবি উল্লেখ করেছেন কাব্য আরম্ভন কাল স্মরণ নাই, তবে কাব্য সমাপ্তির কাল সম্পর্কে 'কবিশশাঙ্ক' দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবি ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। ধর্মমঙ্গল ব্যতীত

তিনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের কাব্য পালাভিত্তিক রচনা এবং সমগ্র কাব্যটি মোট চব্বিশটি পালায় বিভক্ত। পালাগুলি হল যথাক্রমে—

(১) স্থাপনা পালা (২) হরিশ্চন্দ্র পালা (৩) ঢেকুর পালা (৪) রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা (৫) শালেভর পালা (৬) লাউসেনের জন্ম পালা (৭) আখড়া পালা (৮) ফলানির্ম্মাণ পালা (৯) গৌড়যাত্রা পালা (১০) কামদল বধ পালা (১১) জামতি পালা (১২) গোলাহাট পালা (১৩) হস্তীবধ পালা (১৪) কাঙুরযাত্রা পালা (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালা। (১৬) কানড়ার স্বয়ম্বর পালা (১৭) কানড়ার বিবাহ পালা (১৮) মায়ামুণ্ড পালা (১৯) ইছাই বধ পালা (২০) অঘোরবাদল পালা (২১) পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা (২২) জাগরণ পালা (২৩) পশ্চিম উদয় পালা (২৪) স্বর্গারোহণ পালা।

রূপরামের কাব্য অপেক্ষা ঘনরামের কাব্যে কাহিনীগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। রূপরামের কাব্য ২৫টি পালায় বিভক্ত, ঘনরামের কাব্য ২৪টি পালায় বিভক্ত। রূপরাম বন্দনা অংশকে পৃথক পালা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং স্থাপনা পালা থেকে কাব্য কাহিনীর অগ্রগতি। ঘনরাম 'স্থাপনা পালা'কে দুভাগে ভাগ করেছেন, প্রথমত, বন্দনা অংশ এবং দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিপত্তন কাহিনী ও শাপভ্রষ্ট অপ্সরার ধর্মপূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আগমন কাহিনী। 'স্থাপনা পালা' ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ভূমিকা অংশ। রূপরামের কাব্যে হরিশ্চন্দ্র পালাটি রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার পরে, আর ঘনরামের কাব্যে আগে। তাছাড়া পালাভিত্তিক নামকরণের ক্ষেত্রে রূপরাম ও ঘনরামের কাব্যে পার্থক্য দেখা যায়।

মানিকরাম গাঙ্গুলী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি হলেন মানিকরাম গাঙ্গুলী। অন্যান্য কবিদের মতই মানিকরাম কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠে জানা যায়—কবিরা 'বাঙ্গাল' গাঙ্গুলী গাঁই এর অন্তর্গত। কবির পিতামহ অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়নী। মানিকরাম সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কুলীন পরিবারের সন্তান ছিলেন। কবির ভাইরা সকলেই কোন না কোন কারণে বিখ্যাত হয়ে ছিলেন। কবি বর্তমান হুগলী জেলার বেলডিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—

"বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর।
পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর।" (মানিকরাম/২৮)

কবিরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছিলেন। আত্মপরিচয় অংশ বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া কবি কাব্যে চৈতন্য বন্দনাও করেছেন। মানিকরামের কাব্য রচনাকাল নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন পণ্ডিতগণ। কবি প্রদত্ত পয়ার অনুসারে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্থির করেছেন মানিকরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয় ১৪৬৯ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।[১৬] অধিকাংশ পণ্ডিত অবশ্য এই মত মেনে নেননি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মানিকরামের কাব্য রচনার সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছেন ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।[১৭] ডঃ সুকুমার সেন এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১৮] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে মানিকরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয় ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদত্ত মতের সঙ্গে তিনি একমত।[১৯]

মানিকরামের কাব্য পালাভিত্তিক রচনা, সমগ্র কাব্য ১২ টি পালায় বিভক্ত, তবে প্রতিটি পালার পৃথক নামকরণ করা হয়নি। কাব্যের নাম 'বারমতি' (বার্মাতি), অর্থাৎ কাব্য বারো দিনে গীত হত। মধ্যযুগের কাব্যে একমাত্র মানিকরামের কাব্যেই দু'বার দেব বন্দনা লক্ষ করা যায়। প্রথমে দেব বন্দনা করে কবি কাব্য রচনা শুরু করেছেন এবং পরে প্রথম পালার শুরুতে আবার দেব বন্দনা করেছেন তারপর আত্মপরিচয় দিয়ে কাব্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন। কাব্য কাহিনীতে রূপরাম বা ঘনরামের কাব্যের চেয়ে নতুনত্ব কিছু নেই। মানিকরামের কাব্য

স্থূলায়তন, ঘনরামের মতই মানিকরামের কাব্যেও পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রচুর।

ধর্ম সংস্কৃতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল 'শূন্যপুরাণ'। শূন্যপুরাণ মঙ্গলকাব্য নয়। মঙ্গলকাব্যের কোন বৈশিষ্ট্যই শূন্যপুরাণ নামক গ্রন্থখানিতে নেই। ধর্ম সংস্কৃতির দু'টি রূপ, প্রথমত, ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণ এবং দ্বিতীয়ত, ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণই শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত। এই নামকরণ অবশ্য গ্রন্থ-সম্পাদক কৃত (নগেন্দ্রনাথ বসু)। শূন্যপুরাণ আসলে কোন পুরাণ নয়, এটি ধর্মপূজা পদ্ধতি মাত্র। গ্রন্থের সম্পাদক বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের পরিচয় পেয়েই গ্রন্থটির নামকরণ করেন শূন্যপুরাণ। শূন্যপুরাণের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত।গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে – "ইনি ধর্মপূজার আদি পুরুষ।"[২০] অনেকেই মনে করেন রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে পারেন এবং তাঁরা রামাই পণ্ডিতকে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ের মানুষ বলে মনে করেন।[২১] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শূন্যপুরাণের রচনাকাল ধরলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সংযোজন হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মত পণ্ডিত অবশ্য একজন রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেছেন– "ধর্মপূজার ছড়া ও নিবন্ধগুলি ধর্মপূজার প্রবর্তক কোন একটিমাত্র 'শ্রীরামাই' পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না।"[২২] এবং তিনি গ্রন্থখানিকে তত প্রাচীন বলেও মনে করেন না। শূন্যপুরাণ গ্রন্থটিতে প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ অংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা। এই অংশটি থেকেই সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর সম্পর্ক। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী কিভাবে ধর্মমঙ্গলে প্রবেশ করল তা বলা যায় না। অবশ্য লাউসেনের কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর সম্পর্ক খুব ক্ষীণ।

মনসা বা চণ্ডীমঙ্গলের ব্রতকথার কাহিনীতে দেবী ও কাব্য কাহিনীর একটি বিশিষ্ট রূপ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের সে রকম কোন ব্রতকথা জাতীয় কাহিনী প্রচলিত ছিল না, যা থেকে মূল কাব্যের জন্ম হয়েছে। সম্ভবত হরিশচন্দ্রের কাহিনীই প্রাচীন ধর্ম কাহিনীর রূপ। চণ্ডী বা মনসামঙ্গলের যেমন, ব্রতকথার কাহিনীর উপর মঙ্গলকাব্যের ভিত গড়ে উঠেছে, ধর্মমঙ্গল তেমনি হরিশচন্দ্রের কাহিনীর উপর গড়ে না উঠলেও ধীরে ধীরে লাউসেনের কাহিনীর সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ব্রত কথার দেবদেবীর মতই ধর্মঠাকুরও হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবতা, অসাধ্য সাধনের দেবতা, রোগ-ব্যাধি মুক্তির দেবতা, দুষ্ট দমনের দেবতা, উর্বরতা সম্পর্কিত বিষয়ের দেবতা।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা মূলত নারী। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি প্রধান মঙ্গলকাব্যে এবং অন্যান্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারী দেবতার কথাই প্রধান। শিবায়ন বা শিবমঙ্গলকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, আর ধর্মমঙ্গল কাব্য মঙ্গল সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও এর দেবতাটি কিন্তু নারী নয়, পুরুষ দেবতা। সম্ভবত ধর্মদেব নারী দেবতা হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ধর্মদেব কখনো সূর্য, কখনো বিষ্ণু, কখনো রামচন্দ্র, কখনো বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় পুরুষ দেবতায় পরিণত হয়েছে। মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মঠাকুরের মৌলিক রূপ নেই। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি হওয়ায় মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মদেবের পরিচয় বা উপস্থিতি কোনটাই কাব্যে নেই। তাছাড়া পূজা প্রচারে মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মদেবের কোন কঠোর প্রয়াস নেই। এখানে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর অনুরূপ। যাই হোক, ধর্মঠাকুর যে সমাজে পূর্ব থেকেই খানিকটা প্রতিষ্ঠিত তা বোঝা যাচ্ছে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীতে। সুতরাং পূজা প্রচার করতে গিয়ে তাকে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। সে স্বর্গ থেকেই কলকাঠি নেড়েছে, পৃথিবীতে খুব বেশী বার নেমে আসতে হয়নি, অনুচরদের দিয়েই কার্যসিদ্ধি করেছে। তাকে বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলাও করতে হয়নি, তবে কোথাও কোথাও দেবী পার্বতীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ দেবতা হবার সুবিধাটুকু অবশ্য সে ভোগ করেছে। তাছাড়া একটা

সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তার পূজা প্রচারিত হওয়ায় সম্প্রদায়গত বিরোধ এখানে প্রায় নেই। ডোম শ্রেণীর দেবতা উচ্চশ্রেণীতে জায়গা করে নিতে গিয়ে নিজের অলৌকিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভক্তদের চমকিত করেছে মাত্র, মনসা বা চণ্ডীর মত প্রতিষ্ঠা আদায় করতে গিয়ে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। তার পূজা প্রচার সহজ প্রতিষ্ঠা মাত্র। উচ্চশ্রেণীর কাছে ধর্মদেব মনসা বা চণ্ডীর মত গ্রহণযোগ্য হয়নি কোন কালেই। আসলে ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি হওয়ায় কাব্যে ধর্মদেবের প্রভাব কম, তার রূপ অনেক বেশী কোমল এবং তার সঠিক কোন মূর্তি তৈরী হয়নি। নিরাকার হলেও মুসলমান শাসনকালে ধর্মঠাকুরের রূপগত পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে সময়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য তৈরী হয়েছে সে সময়ে দৈব শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছিল। ভক্তি বা বিশ্বাসের জায়গায় স্থান পেয়েছিল অবিশ্বাস ও সংশয়। রূপরামের কাব্যে 'শালেভর পালা'য় শালেভর দিতে গিয়ে রঞ্জাবতীর সংশয় প্রকাশিত হয়েছে। এতে জীবনের মূল্যও কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। রূপরামের কথায়—

"আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর।
কার তরে সাক্ষাত হবেন মায়াধর॥
সভে জানে মরিলে জীবন নাঞি পায়।
তোমার বচন শুনি প্রাণ উড়্যা যায়॥" (রূপরাম/৬০)

রাঢ় অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই অনার্য অধ্যুষিত ছিল, এবং সমগ্র বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হলেও রাঢ়দেশে আর্য প্রভাব অনেক পরবর্তীকালে প্রবেশ করে। প্রথমে আর্য-অনার্য শক্তির দ্বন্দ্ব ও পরবর্তীকালে উভয়ে কিছুটা সহনশীল হয়ে ওঠে, এমতাবস্থায় মনসা বা চণ্ডীর মত লৌকিক দেবীরা পরিমার্জিত হয়ে, সংস্কৃত হয়ে আর্য-সমাজে প্রবেশ করে এবং বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অভিষিক্ত হয়। ধর্মঠাকুরও আর্য-সমাজে গৃহীত হল বটে কিন্তু সংস্কার কম হওয়ায় অনেকটা আদিম রূপেই আর্য-সমাজে প্রবেশ করে, ফলে অন্যান্য দেবদেবীর মত শ্রদ্ধার আসনে প্রবেশাধিকার পেল না। আসলে হয়ত ধর্মঠাকুর সম্পর্কে সংস্কার আর্য জনমানসে এতটাই বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালের কোন সংস্কারই জনমানসের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। চণ্ডী ও মনসা নারীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেও ব্রাহ্মণ পূজারী তাদের পূজক, কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজক হিসাবে রয়ে গেল ডোম পুরোহিতগণ, অনেক পরবর্তীকালে অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতও পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে স্থান গ্রহণ করেছে। যখন ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারা গড়ে উঠেছে তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাদের স্বীকার করতে হয়েছে যে—

"জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
সুপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥" (মানিকরাম/২৩)

ব্রাহ্মণ পূজারী ও ব্রাহ্মণ কবিগণ অবশ্য ধর্মঠাকুরকে চতুর্ভূজ নারায়ণে পরিণত করেছেন, কিন্তু আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। আজও ধর্মপূজায় অনার্য বিধি পালিত হয়। ধর্মমঙ্গলের কাব্য কাহিনী মূলত লাউসেনের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। তাহলেও এখানে ডোম সম্প্রদায়ের বীরত্বের কাহিনী বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে রাঢ়বঙ্গ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং বিপর্যস্ত হয়েছে, মানুষ যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ফলতঃ ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে তারা যুদ্ধবিগ্রহে বীরত্বের রস আস্বাদন করত।

সমাজবৃত্ত ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য যেহেতু রাঢ়ভূমির কাব্য, তাই ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সমাজ মূলত রাঢ়বঙ্গের সমাজ। এখানকার মানুষের ইতিহাস ও এখানকার সমাজের ইতিহাসই ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সামাজিক ইতিহাস। এই ইতিহাস এখানকার মানুষ, মানুষের চরিত্র, ধর্মবোধ, সামাজিকতা, ব্যবহার্য সামগ্রী, তাদের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-

আচরণ নিয়েই গড়ে উঠেছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ কবিদের দ্বারা কাব্য রচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজের আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস এখানে স্থান পেয়েছে সহজেই। তবে উচ্চবর্ণের সমাজের আচরণ শুধু নিম্নবর্ণকে প্রভাবিত করেনি এর বিপরীতক্রমও এখানে সত্য। অবশ্য নিম্নবর্ণের সমাজ অনেকক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের আচরণ, ক্রিয়াকলাপকে তাদের সমাজ জীবনে গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থে পাঠাচ্ছে এই বিষয়টি উচ্চবর্ণের সমাজের বিষয়। কিন্তু এটি নিম্নবর্ণের প্রতি আরোপিত বলে মনে করা হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। বৃদ্ধ পিতামাতার পুত্র, পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ধর্মাচরণে গমন প্রাচীন রীতি, তেমনি বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থদর্শন করানো সন্তানের কর্তব্য। এই বিষয়টি ধীরে ধীরে অনার্য সমাজেও প্রবেশ করেছিল।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ পূর্বোক্ত আলোচনার মতই আমি এখানেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সামাজিক ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

খাদ্য ও পানীয় ঃ প্রথমে আসি ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের কথায়। মানব জীবনের মৌলিক চাহিদাগত উপাদান হল খাদ্য ও পানীয়। রাঢ়বঙ্গ যেহেতু অনার্য অধ্যুষিত ছিল, তাই অনার্যদের খাদ্যরীতি এবং আর্যদের খাদ্যরীতির পার্থক্য ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়। রাঢ়বঙ্গের কবিগণ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনাকালে খাদ্য তালিকা বা রন্ধন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দেননি। যদিও 'হরিশ্চন্দ্র পালা' কিংবা সুরিক্ষার কাহিনীতে 'গোলাহাট পালা'য় এই সুযোগ ছিল। কবিরা আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খাদ্যরীতি, রন্ধন প্রণালীর বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তা চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের তুলনায় নিষ্প্রভ। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বঙ্গের যে আহার্য বস্তুর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টান্ন, টক ইত্যাদি বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্যের কথা আছে। যেমন— নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শাকসবজির ব্যঞ্জন, যথা— ভাজা, সুক্তা, ঝাল, ঝোল, বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদি; আমিষ বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন, যথা— বিভিন্ন প্রকার মাংস ও মাছের ব্যঞ্জন; বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন যথা— পিঠা, পায়েস, দধি, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, দই, ক্ষীর, ক্ষীরখণ্ড, ছানা, পুর দিয়ে তৈরী বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন, লুচি-পুরি ইত্যাদি ; টক ব্যঞ্জনের মধ্যে আমের অম্বল (টক), মাংসের টক, মাছের টক ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, ফলমূল নিরামিষ রান্নায় ব্যবহার করা হত, যথা- বেগুন, মূলা, নিম, শিম, পানিফল, কাঁচা আম, মানকচু, কেসুর, নারিকেল, পটল, বকুল ফল, করলা, থোড়, অপক্ব পনস (ইঁচড়), ওল, কলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার শাক, যথা— নালতে, পালং, পলাকড়ি, কচুশাক, সুষনি, কলমী ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার ডাল যথা— মুগ, বিউলি ইত্যাদি। মিষ্ট ব্যঞ্জনের জন্য চালের গুঁড়ি, দধি, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, গুড়, নারিকেল, দই ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন প্রকার মাছ, যথা— কই, শফরী, চিংড়ি, রুই, কাতলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার মাংস যথা— মহিষ, ছাগ, হরিণের মাংস, শূকরের মাংস জনপ্রিয় ছিল। ধর্মমঙ্গলে মহামাংস অর্থাৎ নরমাংস ব্যবহারের কথা থাকলেও হয়ত জনসমাজে নরমাংস তখন আহার্য হিসাবে গ্রহণ করা হত না। অবশ্য কোন কোন আদিম জনসমাজে নরমাংস ব্যবহার করা হত। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেবের নরমাংস গ্রহণের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা সম্ভবত পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থতা বজায় রাখার জন্য।

ধর্মমঙ্গলে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার ধান-চালের মধ্যে উড়ি ধানের চালের কথা বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে। যথা—

'উদূখল এরণ্ডে ভাজিবে উড়ি ধান।' (ঘনরাম/২৯৪)

কিংবা- 'উড়ি ধানে আতব তণ্ডুল সমাধিল।' (রূপরাম/১৭৪)

কিংবা- 'উড়িধান্য ভানিঞা তণ্ডুল কৈল সায়।' (মানিকরাম/২৬৭)

রান্নায় বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করার রীতি সকল মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায়। বাঙালী ব্যঞ্জনে বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করত, যথা— জিরা, ধনে, কর্পূর, হিঙ, আদা, মরিচ, তেজপাতা, কালজিরা ইত্যাদি। বাঙালী ভোজন রসিক তাই মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন আহারে অভ্যস্ত। ধর্মমঙ্গলে ব্যবহৃত মসলার উল্লেখ পাচ্ছি বিভিন্ন কবির কাব্যে। যেমন রূপরামের কাব্যে বাটা মসলার কথা পাওয়া যায়—

"হিঙ্গ জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।" (রূপরাম/৫১)

কিংবা, ঘনরামের কাব্যের বিবরণে—

"ব্যঞ্জন রন্ধনে জিরা মরিচ কর্পূর॥
সুরসাল দিয়া ঝাল হেম থালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে॥" (ঘনরাম/২৯৮)

রন্ধনকার্যে গোটা মসলা ও বাটা মসলা উভয়ই ব্যবহার করা হত। বাঙালীর রন্ধনে আহার্য হিসাবে আর একটি সুস্বাদু দ্রব্য ব্যবহার হত, তা হল কুমড়ো বড়ি। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কুমড়ো বড়িকে বলা হত 'ফুলবড়ি'। রূপরাম ও মানিকরামের কাব্যে বড়ির ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়া রন্ধনকার্যে তেল, ঘি ইত্যাদির ব্যবহার হত। তেলের মধ্যে মূলত সরষের তেলের ব্যবহার প্রধান। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জনের নাম ও রন্ধন প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে 'গোলাহাট পালা'য়। যথা—

"রসউলা ব্যঞ্জনে করেন ঝোল ভাজা।
মুগডালি সান্তানিল ব্যঞ্জনের রাজা।
বার্তাকু নিমেতে সিম করিল সুপাক।
তৈলে টলটলি করে বাথুয়ার শাক॥
রান্ধিল পুতিকা শাক দিয়া ফুলবড়ি।
চুঁয়া চুঁয়া ঘৃতে ভাজা করে পলা কড়ি॥
মানের বেসারি রান্ধে ব্যঞ্জন রসাল।
ঘটে নিঙ্গারিয়া নিল আদ্রকের ঝাল॥
দশ গোটা লইয়া ভাজিল নারিকল।
ভিন্ন ভিন্ন রান্ধিল কেসুর পানিফল॥" (রূপরাম/১৭৪)

ঘনরামের কাব্যেও 'গোলাহাট পালা'য় বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জনের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে–

"মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজা
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা॥
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জল করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ঢালে॥
কল কল সম্বরে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়া ঝাড়া॥
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব॥
ভাজিল বেগুন শিম নিম দিয়া ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ থোড়॥

নারিকেল অপক্ক পনস পানিফল।
বিশেষ যতির ভক্ষ্য হবিষ্য নির্ম্মল॥
ফুল মূল অপর অনেক ভেজে তোলে।
তিক্ত রসে সুক্তা রামা রান্ধে ঝালে ঝোলে॥" (ঘনরাম/২৯৮)

বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যে নানা প্রকার আমিষ রান্নার বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন ঘনরামের কাব্যে 'হরিশ্চন্দ্র পালা'য় মদনার রন্ধন—

"সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোনার থাল ঢাকিল উপরে॥
উড়ি চূর্ণের মাথার মজ্জায় তোলে বড়া।
বুকের কালিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥
নাড়া ঝাড়া দিয়া ভাজে ঘৃত জবজব।
পরিপাটি মাংসের রন্ধন হৈল সব॥" (ঐ/৪৫)

কিংবা— "রোহিত মৎস্যের জুস যতনে রান্ধিয়া।
রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া॥" (মানিকরাম/৬৮)

আবার, রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণে বাঙালীর রন্ধন প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমিষ ও নিরামিষ বিভিন্ন প্রকার রান্নার কথা আছে—

"শুসুনির শাক এনে সম্বরিবে তৈলে।
শেষে দিবে সর্ষপের বাটনা সিদ্ধ হলে॥
অল্প জ্বালে অল্প অল্প আসিবেক ফুটে।
দৃঢ় করে দিয়ে কাটি দিয় তাকে ঘেঁটে॥
গুঁড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি।
অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে হাঁড়ি।
কটু তৈল কিছু দিয়ে সম্বরিয়া পুন।
প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন॥
--- --- --- ---
আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া।
যথোচিত জল দিয়া জ্বাল দিবে বাড়া॥
সিদ্ধ হৈলে শেষে দিবে শোভাঞ্জনি ফুল।
কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল॥
ঝোল রেখে ঝাল দিয়া জ্বাল দিও পরে।
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে॥
চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাঁপা নটে শাকে।
অধিক লবণ দিয়া পাক কর্য তাকে॥
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ।
প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ॥
ঝোলে দিয়া কৈ মাছ করে চড়বড়ি।

তৈলতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি॥
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর।
কাঠি দিয়া করে দ্রব যেন হয় ক্ষীর॥
- - - - - - - - - - - -
শফরীর পেট চিরি বারি করে পোঁটা।
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা॥
লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায়।
শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায়॥" (মানিক/১০০-১০১)

অম্বল বা টক ব্যঞ্জন বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয়। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেব লুয়ার মাথার টক রান্না করতে আদেশ দিয়েছে। সুরিক্ষা লাউসেনকে আপ্যায়িত করার জন্য আমের টক রান্না করেছে—

"বার তিন তিক্ত হাঁড়ি ধুয়ে সীমন্তিনী।
আমের অম্বল রান্ধে দিয়া দধি চিনি॥" (ঘনরাম/২৯৮)

ভোজনরসিক বাঙালী মিষ্টান্ন, পিঠা, পায়েস, ক্ষীর, লুচি ইত্যাদির রসিক—

"সঝাল বঞ্জাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া॥
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা॥
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে॥" (ঐ)

রাঢ়বঙ্গে মধ্যযুগে ঘি ও দুধের প্রাচুর্য ছিল, তাই রাঢ়বাসী অতিথি আপ্যায়নের জন্য মিষ্টান্নের পাশাপাশি ঘরে পাতা দইয়ের আয়োজন করতে ভুলতো না। রাজা হরিশ্চন্দ্রও ব্রাহ্মণ অতিথির জন্য ঘরে পাতা দইয়ের আয়োজন করেছে। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে পাওয়া যায়—

"গাভী দুয়্যা দিল রাজা বসাইল কড়া॥
নির্মাণ করিল পিঠা অতঃপর মজা।
সাজ দই ঢালিয়া ঢাকন দিল রাজা॥" (রূপরাম/৫১)

বাঙালীর রন্ধন প্রণালী, পরিবেশনাদিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জনে আমিষ ও নিরামিষ স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধন করা হত এবং ব্যঞ্জন তালিকায় এক সঙ্গে তিক্ত, টক বা অম্বল, ঝালঝোল, মিষ্টান্ন সকলই থাকত। পরিবেশনকালে প্রথম তিক্ত, তারপরে যথাক্রমে ঝাল-ঝোল, টক ও সবশেষে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হত। আবার বাঙালী মেঝেতে উঁচু পিঁড়ি পেতে আহার করতে অভ্যস্ত। আহার স্থলের ডানদিকে নির্দিষ্ট স্থানে জলপাত্র রাখা হত—

"ভোজন করিতে স্থল করিল রাজন॥
উচ পিঁড়া আনি রাখে সংযোগ পুরট।
রাখিল জলের ঝারি দক্ষিণ নিকট॥" (ঐ)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালী চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, সন্দেশ, নাড়ু খেতে অধিক অভ্যস্ত, অবশ্য বাঙালী মাত্রই ঐ সমস্ত শুকনো খাবারে অভ্যস্ত। তাইতো, গৌড় যাত্রাকালে রঞ্জাবতী লাউসেন ও কর্পূরকে মুড়ি, মুড়কি, চিড়া বেঁধে দিয়েছে—

"মুড়ি চিড়া সদাই আঁচল ভর‍্যা দিবে।" (ঐ/১১৮)

অথবা "খুধা না সহিতে পারে খাওয়াবে সকালে।
নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে॥" (মানিকরাম/১৬৮)

ধর্মমঙ্গলে 'চিড়াভাজা'র কথা পাওয়া যায়। শুকনো খাবার হিসাবে চিড়াভাজা ব্যবহৃত হত—

"নাড়ু চিনি কিন্যা দিব আর চিড়াভাজা॥
আর দিব সন্দেশ মুড়কি পাকা কলা।" (রূপরাম/১৫৮)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালীরাও পানের বহুল ব্যবহার করত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তারও পরিচয় আছে। তাছাড়া পান-সুপারির দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হত এবং কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যসিদ্ধির জন্য প্রেরণ করা হলে পান-সুপারি দেওয়া হত। যেমন—

"পান ফুল দিয়ে বলে সাধ প্রয়োজন॥
পান বন্ধ্যা প্রণাম করিয়া গেল মাল।" (ঘনরাম/১৮৫)

কিংবা, পান গ্রহণ করার অর্থ হত কার্যে রাজী হওয়া বা মত দান করা। যেমন—

"হেনকালে ইন্দামেটে উঠাইল পান।" (ঐ/৫৮৯)

খাওয়ার পর পান খাওয়ার অভ্যাস অতি প্রাচীন, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার উল্লেখ দেখা যায়। গোলাহাট পালায় সুরিক্ষা লাউসেনকে আহারের পর পান খাবার কথা বলেছে—

"গা তোল গা তোল রায় করিতে ভোজন।
কর্পূর তাম্বুল খায়্যা করহ শয়ন।" (রূপরাম/১৭৫)

পান-সুপারি অনেক সময় সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত। 'জাগরণ পালা'য় মহামদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় লখাই ডোমনী সনকা ডোমনীর সাহায্য প্রার্থনা করলে সনকা ডোমনী তার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও লখ্যার সুখের কথা বলে—

"ভাতারের ধন খায়্যা পাটাপারা বুক।
কোন লাজে আলি মাগী আমার সমুখ॥
গাগা গুয়া খাইলে যবে গুছিলেখা পান।
বনি বলি নাঞি দিলে চিব্যা অর্ধখান॥" (ঐ/৩২৮)

কিংবা, ঘনরামের কাব্যে সনকার উক্তি—

"মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে জোগান পান গালে পোটা গুয়া॥" (ঘনরাম/৬২২)

এছাড়াও রাঢ়বঙ্গের মানুষ বিভিন্ন প্রকার পানীয়, যথা— দুধ, মদ বা উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করত, কবিগণ তার উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পানীয় হিসাবে প্রচুর মদ্য ব্যবহৃত হত। তাছাড়া ডোম সমাজে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে মদের প্রয়োজন হত। ডোমেরা যথেচ্ছ মদ্যপান করত, তার প্রমাণ কালু ডোম চরিত্রটি। তাছাড়া নেশাকর দ্রব্য হিসাবে গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-

"ভাঙ্গ পোস্ত ভাজা ভুজা ভুঞ্জে পাঁচ রস।
মেটে বলে মদ খাব যেয়ে কোশ দশ॥" (ঐ/১২৯)

কিংবা, "চিড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।
দেখে বলে কেলে সোনা হের দেখ দোস্ত॥" (ঐ/১২৮)

ধর্মমঙ্গলে পোস্ত ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নেশার উপকরণ হিসাবেও পোস্ত ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে তামাকের প্রচলন হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে

তামাকের ব্যবহার দেখা যায়—

"যুগল তামুলি আছে তামুক জোগায়্যা।
চিত্তের সন্তোষ পায় চাঁদমুখ চেয়্যা॥" (মানিকরাম/২৪৭)

মদ্যপানের জন্য ডোমরা শুঁড়ি বাড়ি ভিড় করত। ঘনরাম শুঁড়িখানায় মদ্যপানের চিত্র অঙ্কন করেছেন-

"মদমাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত॥
... ...
পুনরপি শুঁড়ি বাড়ি লাগাইয়া লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা॥
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে॥ (ঘনরাম/৬০১)

গৃহস্থালী দ্রব্য ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়বঙ্গের মানুষের ব্যবহৃত গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত গৃহস্থালীদ্রব্যের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। ধর্মমঙ্গলে কলসী, থালা, বাটি,ঘটি, জাঁতা, চুপড়ি, প্রদীপ, বাটা, ডাবর, খাট পালঙ্ক, ছাতা ইত্যাদির সুলভ উল্লেখ চোখে পড়ে। রন্ধনকার্যে হাঁড়ি, থালা, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। পানীয় জল আনার জন্য কিংবা জল রাখার জন্য কলস ও ঘড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। যেমন ধর্মমঙ্গলে 'গোলাহাট পালা'য় লাউসেন সুরিক্ষাকে কাঁচা হাঁড়িতে রন্ধন করার আদেশ দিয়েছে—

"রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।" (ঐ/২৯৪)

সাধারণত রন্ধনকার্যে মাটির হাঁড়িই ব্যবহার করা হত যা কুমারের চাকে তৈরি হত, তাছাড়া কুম্ভ বা কলসী, ঘড়া, সরা ইত্যাদি মাটির তৈজসপত্র কুমারের চাকে তৈরি হত। তাইতো সুরিক্ষার প্রতি লাউসেনের নির্দেশ— "কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।" (ঐ/২৯৪)। হাঁড়ির মুখে মিলিয়ে ব্যবহারযোগ্য সরা (ঢাকনী) ব্যবহার করা হত। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় পাই। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর উপমা দিতে গিয়ে কবিগণ হাঁড়ির মুখে সরার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন—

"বর নয় বনি গো সে গগনের তারা।
হাঁড়ি যোগ্য বিধাতা গড়িল যেন সরা।"(রূপরাম /২৪৭)

রন্ধনে বিভিন্ন তরিতরকারি রাখার পাত্র হিসাবে বাটি ও থালার ব্যবহার করা হত। তাছাড়া আহারের সময় থালা ও বাটির ব্যবহার হত। বিবিধ ব্যঞ্জন বাটিতে থরে থরে পরিবেশিত হত এবং এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। যেমন—

"ঘরে জ্বলে প্রদীপ বাহিরে সাজে আলা।
দূর হতে দেখে চোর ঘটি বাটি থালা॥ (ঐ/৮২)

কিংবা— "স্থান করা স্বর্ণ থালে থ্যাতায় ওদন॥
শাকাদি ব্যঞ্জন সব সুবর্ণ বাটীতে।
থরে থরে থোথায় থালার চারি ভিতে॥" (মানিকরাম /২৬৮)

মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গেও পানীয় জল হিসাবে সাধারণত নদী বা পুষ্করিনীর জল ব্যবহৃত হত। বাঙালী রমণীগণ কলসী কাঁখে পানীয় জল আনত। ঘনরাম লিখেছেন—

"কাঁকে কাঁচা কলসী গমনে বহে ঝড়॥

ত্বরাতরি উপনীত তারাদিঘী ঘাটে।" (ঘনরাম/২৯৬)

তাছাড়া পানীয় জলের জন্য কূপের জলও ব্যবহার করা হত। পানীয় জল কলসী ও ঘড়াতে সংরক্ষণ করা হত। পানীয় জল, পা ধোবার জল, মদ ইত্যাদি ঝারিতে রাখা হত। ঝারি নলযুক্ত এক প্রকার পাত্র বিশেষ। যথা—

"দক্ষিণে জলের ঝারি খুরি বাটি থালা।" (রূপরাম/১৭৫)

কিংবা, শুঁড়ির দোকানে ঝারিতে মদ পরিবেশনের চিত্র পাওয়া যায়—

"উঠ শিবা ভাল মদ দেরে ঝাড়ি কুড়ি।
ঘন ডাকে ঘোর ঘুমে বারি হোল শুঁড়ি॥" (ঘনরাম/৫৯৯)

পান ও বাটার বিভিন্ন রকম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায় বাঙালী সমাজে। ধর্মমঙ্গলে পান ও বাটার প্রতীকী ব্যবহার লক্ষণীয়। রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের বিবাহদানের পর গৌড়েশ্বর সম্মানপূর্বক পানবাটা প্রদান করে কর্ণসেনকে ময়নার অধিপতি নিযুক্ত করে —

"লালবন্দী বত্রিশ কাহন কর আঁটা।
হাতে হাতে কর্ণসেনে দিল পান পাটা॥" (ঐ/৭৭)

কিংবা— "বিপাক পড়িল বড় না দেখি উপায়।
দিদির পানের বাটা গড়াগড়ি যায়॥" (রূপরাম/৩৪৬)

বাঙালী পরিবারে মূলত মাটিতে চূলা বা উনুন পেতে রান্নার কাজ হত। এবিষয়ে অবশ্য বাঙালী রমণীগণও বিশেষ পারদর্শী ছিল। ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা তিন খাঁজ যুক্ত বালির চুলায় রন্ধন করে অসাধ্য সাধন করেছিল—

"নির্ম্মাণ বালির চুলা চাপাইল হাঁড়ি।
দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিল তিহড়ি॥" (ঘনরাম/২৯৭)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালী সমাজে ঢেঁকির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাঙালী রমণীরা ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল সংগ্রহ করত, তার উল্লেখ আছে ধর্মমঙ্গলে। রূপরামের কাব্যে তার উল্লেখ পাই—

"ভেরান্ডার ঢেঁকিতে ভাঙ্গিল উড়িধান।
ভগবতী আপনি সাক্ষাত অধিষ্ঠান॥" (রূপরাম/১৭৪)

তাছাড়াও গৃহকর্মের সহায়ক বিভিন্ন গৃহস্থালির দ্রব্য, যথা- ধুচুনি, চুপড়ি, চালুনি, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, ছাতা, প্রদীপ, আসন, পাটি ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। ধুচুনি, চুপড়ি, ঝুড়ি, ডালা, কুলা গৃহস্থালীর দ্রব্য হিসাবে অপরিহার্য ছিল। কবি লিখেছেন—

"কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বন্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতাছাতি॥" (ঘনরাম/৩৪৭)

মেয়েরা গৃহকর্মের উপযুক্ত চাটাই, তলপাতার পাটি বুনে নিত—

"মউরা মলিন-মুখী বোনে তালপাত।" (রূপরাম/২০৪)

প্রদীপ বাঙালীর মাঙ্গলিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। পূজা-পার্বণাদি শুভকর্মে তেল বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হত. প্রত্যহ গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো বাঙালীর সংস্কৃতির একটি অংশ। যথা—

"উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধূনা ধূমে অন্ধকার॥" (ঘনরাম/১২৫)

পূজা-পার্বণাদিতে এবং গ্রীষ্মকালে অর্থশালী ব্যক্তিরা চামর ও পাখা বা বিজনী ব্যবহার করত। যেমন-

"চামর বিয়নী পাখা সভাকার হাথে।
চলিল নাগর সব সুরীক্ষার সাথে॥" (রূপরাম/১৬৯)

চোররা তাদের সহায়ক অস্ত্র সিঁদকাটি গৃহস্থের গৃহে গর্ত খননকার্যে ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গলে ইন্দামেটের চুরি প্রসঙ্গে বারবার সিঁদকাটির প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন—

" মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি।" (ঘনরাম/১২৬)

সৌখিন দ্রব্য ও রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে দর্পণ, চিরুণী, খাট, পালঙ্ক ব্যবহৃত হত। ধনীরা শয্যানির্মাণে খাট, পালঙ্ক ব্যবহার করত— ধর্মমঙ্গলে তার ব্যবহার পাওয়া যায়। তাছাড়া সুসদৃশ আসন, কম্বল ইত্যাদি ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। যথা—

"নিকুঞ্জ মন্দির শোভা সুন্দর সদন॥
তায় খাট পালঙ্ক অনেক রূপ দেখি।
একেক নাগর সঙ্গে চারি পাঁচ সখী॥
... ...
বসিতে আসন দিল অরুণ কম্বল
সুবর্ণ ঝারিতে দিল পরিপূর্ণ জল। (রূপরাম/১৬২)

নিরুপদ্রব সমৃদ্ধ জীবন বোঝাতে খাট, পালঙ্ক, চামর পাখা বা বিয়নী এই সমস্ত প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধনার উপকরণ হিসাবে কমণ্ডলু, চামর ইত্যাদি ব্যবহার করত। শীতলপাটি বোধ হয় বাংলাদেশ ভিন্ন কোথাও ব্যবহৃত হত না। শয্যার উপকরণ হিসাবে খাট বা পালঙ্কের উপর শীতলপাটি বিছানো হত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে শীতলপাটির ব্যবহার আছে—

"পাতিল শীতলপাটি পরিসর পান।
তায় পুন রাখিল সুবর্ণ খাটখান॥" (ঐ/৬৯)

বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ প্রদীপ, ধূপ-ধুনা, ধুনাচি, কমণ্ডলু, চন্দন, আতপ তণ্ডুল, যোগপাটা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"ধূপ ধুনা ধুনচী ধবলাসন ধুতি।
চন্দন অঙ্গুরী অর্ঘ্য হেন পুষ্পযুতি॥" (ঘনরাম/৫৬৮)

কিংবা— "কমণ্ডলু কমল লইয়া করতার।
অঞ্জলি করিয়া অঙ্গে দিলা তিনবার॥" (মানিকরাম/৮৭)

ধবলাসন, ধুতি, যোগপাটা অবশ্য রাঢ়বঙ্গের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ধর্মমঙ্গলে এসব উপকরণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এভাবে দেখা যায় বাংলার লোকায়ত ইতিহাসের নানান চিহ্ন ও দ্রব্যাদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

ধর্মমঙ্গলে জীবন-জীবিকার সাহায্যার্থে গৃহস্থালীর উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, যেমন- বঁটি, ক্ষুর, বঁড়শি, কাটারি বা কাতি (কর্তরিকা থেকে জাত- কর্তরিকা> কত্তরিআ > কাটারি) কুঠার, জাঁতি, বাটালি বা বাটাল, পাখুরী, সাঁড়াশি, নেহাই, হাতুড়ি ইত্যাদি। শাকসবজি কাটার জন্য বঁটি এবং নাপিত চুল, দাড়ি কামানোর জন্য ক্ষুর ব্যবহার করত। ঘনরামের কাব্যে দেখি রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে শালেভর দিতে গিয়ে বঁটি, ক্ষুর ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দিয়েছে—

"সুমঞ্চে সন্ন্যাস কাটি গাড়ে চন্দ্রবান বঁটি
ঘোরমুখী ক্ষুর খরসান।" (ঘনরাম/৯৬)

কাটারি বা 'কাতি' গৃহকর্মে ব্যবহৃত অস্ত্র বিশেষ। হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্রকে কাটার সময় 'কাতি' ব্যবহার করেছে–

"কান্দিতে কান্দিতে রাজা কাতি ধরে হাতে।

পূর্বাস্য হইয়া বসে পুত্রেরে কাটিতে॥" (মানিকরাম/৬৬)

কুঠার একটি বহু ব্যবহৃত গৃহস্থালীর অস্ত্র বিশেষ, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার ব্যবহার আছে। গৃহস্থালীর কার্য ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র হিসাবেও কুঠার ব্যবহার করা হত। কাঠ কাটার কাজে, কঠিন অস্থিযুক্ত মাংস কাটার জন্য কুঠার একটি সুবিধাবহুল অস্ত্র—

"কুঠারে কাটিয়া মজ্জা করিল বাহির।" (ঐ/৪৪)

দেবী প্রদত্ত অস্ত্রের ফলা নির্মাণ করার জন্য কামিল্যা কুঠার নিয়ে অরণ্যে গাছ কাটার জন্য গিয়েছিল-

"কুঠার কুড়ালি আগুলিল বাস করে।
পুনরপি চোট হানে বকুল উপরে॥" (রূপরাম/১০৩)

ছুতোর মিস্ত্রিরা কাঠের জিনিসপত্র নির্মাণ করার জন্য তাদের সহায়ক অস্ত্র বাটালি, করাত ইত্যাদি ব্যবহার করত। যথা—

"বাম হাথে নিল বাস পাখুরি বাটালি।
পথে যাত্যে স্মরণ করিল ভদ্রকালী॥" (ঐ)

কিংবা— "নেহাই হাতুড়ি জাঁতা লয়্যা লঘুতর।" (মানিক/৩৮১)

করাত কাঠ ছেদনের অস্ত্র বিশেষ। লাউসেনকে হাতি চুরির মিথ্যা অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। লাউসেনকে যেখানে শাস্তি দিয়ে রাখা হয়েছিল তার এক পাশে শেল অন্য পাশে করাত বসানো ছিল। কবির বর্ণনায়–

"বাম পাশ নাড়িতে পঞ্চম শেল ফুটে।
ডানি পাশ নাড়িতে করাতে মাংস কাটে॥" (রূপরাম/১৮৭)

কিংবা, হরিশ্চন্দ্র ও রানী মদনা করাতে স্বীয় পুত্রের দেহ ছেদন করেছিল–

"জায়া পুত্র যার শিরে ধরিল করাত।
অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে দিল কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥" (ঘনরাম/৪৩)

গৃহকর্মের উপকরণ হিসাবে কখনো কখনো পূজা-পার্বণে বলিদানের জন্য খাঁড়া বা খড়গ ব্যবহার করা হত। যথা—

"সাধুর সাহস শুনি খড়গ নিল হাতে।
পুত্রে বলি দেন রাজা ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥" (ঐ)

ছুরি কাটারির চাইতে ক্ষুদ্র অস্ত্র বিশেষ। আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে তা ব্যবহার করা হত। আবার নাপিত, চুলদাড়ি কামানোর জন্য ধারালো ছুরি ব্যবহার করত। কানড়া মিথ্যাবাদী ভাটের শাস্তি দেওয়ার জন্য নাপিত ডেকে মাথা কামিয়ে নিয়েছিল –

"জামাজোড়া কাড়্যা নিল ছুরি যমধর।
নাপিত আনিঞা মাথা মুড়াল্য সত্বর॥" (রূপরাম/২৩৬)

গৃহস্থালীর অস্ত্র জাঁতির ব্যবহার প্রাচীন। পান-সুপারি প্রিয় বাঙালী ঘরে অস্ত্রটি নিত্যপ্রয়োজনীয়। সুপারি কাটার জন্য জাঁতি ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ পাই কাব্যে। এখানে উপমা হিসাবে জাঁতির ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। যথা-

"মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট।
কষ্নি জাঁতির কাছে গুয়া কত ডাট॥" (মানিকরাম/৩৮৪)

কামারের যাঁতা ও সাঁড়াশি ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় ধর্মমঙ্গলে–

"যাঁতা টানে মণ্ডল ভাগিনা সহচরী।

অঙ্গারে আগুন জ্বলে দপ দপ করি॥
সাঁড়াশিতে ধরিয়া সঘনে লোহা পাড়ে।
কালের করাত কাটি শাল কাঁটা গড়ে॥ (রূপরাম/৪২)

মাছ ধরা একটা প্রাচীন উপায়, সভ্য মানুষ মাছ ধরার উপকরণ বঁড়শি ব্যবহার করত। চাড় বা টোপ বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরার কথাও ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। যথা–

"পোড়ায়ে বঁড়সা মুখে জোগাইল টোপ॥
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।" (ঘনরাম/৪৯০)

পাখি শিকার, ছোট ছোট বন্য জন্তু শিকারের জন্য বাঁটুল ব্যবহার করত রাঢ়বাসী। ছেলেরা তাদের ক্রীড়ার উপকরণ হিসাবে মূলত শিকারের জন্যই বাঁটুল ব্যবহার করত। ক্রুদ্ধ কালুডোম বাঁটুলের গুলিতে লোহাটাবজ্জরের নৌকায় ছিদ্র করে দিয়েছিল—

"মার্ মার্ বলে ঠেটে বাঁটুল মারিল এঁটে
ফেটে গেল কোটালের লা॥"(ঐ/৪৯২)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহে ভরপুর হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। রাঢ়বঙ্গ নানা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে আকীর্ণ ছিল, ফলে বীর রসের কাব্য-কাহিনীর প্রতি রাঢ়বাসীর এক প্রকার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। রাঢ়বাসীর এই রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। যুদ্ধবিগ্রহময় কাব্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে যা রাঢ় বাংলার লোক ইতিহাস, সমাজ ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অতঃপর আসি যুদ্ধাস্ত্রগুলির কথায়। যুদ্ধের বর্ণনায় ধর্মমঙ্গলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়। তাছাড়া রাজা মহারাজা বা ধনীরা শিকার কার্যেও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধরীতির বর্ণনা প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের খুব একটা প্রয়োগ হয়নি। তাই মূলত প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় এখানে, অবশ্য ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের কাব্য হওয়ায় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান ও বন্দুকের ব্যবহার পাওয়া যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যগুলির চাইতে ধর্মমঙ্গলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার দেখা যায়। ইঁট-পাটকেল, ঝাটি-ঝকড়া, মুদগর-মুষল, তীর-ধনুক ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার রামায়ণ ও মহাভারতে মুখ্য, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁড়া, খড়্গ, কুঠার, টাঙ্গন, টাঙ্গী, তীর, ধনুক, অসি বা তরবারী, কাটারি , ঢাল ইত্যাদি প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার হতই পাশাপাশি অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান, গোলা, বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে যুদ্ধের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে কালুর বীরত্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে-

"ঝুপ্ ঝাপ্ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলিশর।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর॥
চৌদিকে চাপিয়া গুলি বাজে দুমাদুম্।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্॥
মণ্ডূকমণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জরনিকরে যেন কেশরীর দর্প॥
সেইরূপে সেনামাঝে বীর বান্ধে রিষ।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ॥
ঝন্‌ঝান্ ঝাঁকে খাঁড়া টান টান টাঙ্গি।
ঠন্ ঠন পড়ে মাথা পাগ বান্ধা রাঙ্গি॥

শন্ শান্ শুনি শুধু শরের শবদ।
একা কালু এক লক্ষ রণে বিশারদ॥
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায়॥" (ঐ/৩৮৪)

টাঙ্গি বা টাঙ্গন কুঠারের মত এক ধরনের অস্ত্র বিশেষ, যা দূর থেকে নিক্ষেপ করে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। লখাই ডোমনী টাঙ্গি নিক্ষেপ করে কাম্বা ডোমের শিরচ্ছেদ করেছিল—

"সত্বর কুঞ্জর পিঠে উঠে করে ভর।
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর॥
মেলা টাঙ্গি ফেলায়ে কাম্বার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর॥" (ঐ/৬৩৬)

শেল ও শাঙ্গী এক ধরনের নিক্ষেপ করার অস্ত্র বিশেষ। আমরা জানি লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কামরূপ যুদ্ধপালায় কালুকে শেল নিক্ষেপ করতে দেখি—

"হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে শাঙ্গী শেল রাখে
ঝপ ঝাপ্ রাখিছে শর।
তীর গুলি আদি ঢালেতে সমাধি
বীর বায়ে করে ভর॥" (ঐ/৩৮৮)

ঘনরামের কাব্যে কামান, গোলা, বারুদের ব্যবহার পাই। কামরূপরাজ কালু ডোমের সঙ্গে যুদ্ধে কামান ও গোলা ব্যবহার করেছে—

"একাকার ধূম দুড়ুম দুড়ুম
শব্দে ছোটে বড় গোলা।
রাজা বলে মার্ কামানে বেটার
হাড় মাস করে তেলা॥ (ঐ)

রূপরামের কাব্যে বন্দুক ব্যবহারের কথা পাই। লাউসেন কর্ণসেনের অস্ত্রাগারে ফলা খুঁজতে গিয়ে সারি সারি কামান বন্দুক দেখতে পায়—

"সারি সারি নানা অস্ত্র বন্দুক কামান।
দেখিল বিনোদ ফলা অপূর্ব নির্মাণ॥" (রূপরাম/১০২)

অসি বা তরবারি অতি প্রাচীন অস্ত্র। প্রাচীন যুদ্ধপদ্ধতিতে অসির ব্যবহার লক্ষণীয়। ধর্মমঙ্গলে অসির ব্যবহার দেখা যায়—

"উত্তরে অঘোর বাজে অসি দড়মসা।
হইল বিকল কেহ হারাইল দিশা॥" (মানিকরাম/৫১৭)

মধ্যযুগীয় শাস্তি ব্যবস্থায় শূলে দেওয়া একটি বিশিষ্ট রীতি। অপরাধীকে শূলে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে শূলের উল্লেখ আছে, অবশ্য কবি এখানে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন। হরিহর বাইতিকে মহামদ চুরির শাস্তি হিসাবে শূলে দিয়েছে—

"হরিষে দেখিছে পাত্র বাইতির শূলি।
নিদারুণ কোটাল বায়েনে ধরে তুলি॥" (ঘনরাম/৭০০)

মধ্যযুগে যুদ্ধরীতির বর্ণনা প্রাচীন কাব্যগুলির অনুসরণে, সুতরাং মঙ্গলকাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা ও ব্যবহৃত অস্ত্রাদি

প্রাচীন; তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ধর্মমঙ্গলে নবীনত্ব লক্ষণীয়।

সাজসজ্জা ঃ বাঙালীর ইতিহাসের অন্যতম উপাদান পোশাক-পরিচ্ছদ। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দিয়ে একটি জাতির মানসিক গঠন ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, এতে বাঙালীর কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। স্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে মানুষ লজ্জানিবারণার্থ যে সকল পোশাক ব্যবহার করে তাকেই বোঝায়। তাছাড়া নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানে শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধরনের গহনা-অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত। রাঢ়বাসী বাঙালী মূলত শাড়ী বা পাটশাড়ী, পট্টবাস, ধুতি, জামা, কাঁচুলি, জুতা, পাগড়ী, টুপি, কোমরবন্ধ ইত্যাদি পরিধান করত। বাঙালী মহিলাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র হল শাড়ী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাটের শাড়ী বা পট্টবস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। উৎসব অনুষ্ঠানে পাটের শাড়ী পরিধান করা হত। রঞ্জাবতীর বিবাহকালে উপস্থিত নারীগণ পাটের শাড়ী পরিধান করেছে—

"কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া।
বিনোদ পাটের শাড়ি যায় লোটাইয়া॥" (রূপরাম/৩৪)

ঘনরামের কাব্যে লাউসেন কালুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে তার নারীদের পাটের শাড়ী পরাবে। রূপরামের কাব্যে গুয়াবুটি শাড়ী নামে এক জাতীয় শৌখিন শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে অতি উন্নত ছিল তার প্রমাণ আছে। বিশেষত বাংলার মসলিনের জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল। রূপরামের সুরিক্ষা পরিহিত শাড়ীটি কি মসলিন ? কবির বর্ণনায় —

"বাছিয়া বসন পরে নাম গুয়াবুটি।
বাইশ হাত বসন বাঁ হাতে হয় মুঠি॥" (ঐ/১৬৯)

তাছাড়া নারীরা উড়নি, অন্তর্বাস হিসাবে বক্ষবন্ধনী বা কাঁচুলি ব্যবহার করত। মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে কলিঙ্গা পুরুষের বেশ ধারণ করে, কিন্তু নারীর চিহ্ন স্বরূপ শঙ্খ, সিন্দুর ও উড়নি পরিধান করে—

"করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দূর।
নারীর নিশান রাখি বেশ করে দূর॥
গায়ে দিল উড়ানী পুড়নি রৈল মনে।
কেমনে বাঁচিবে বাছা অভাগী বিহনে॥" (ঘনরাম/৬৪০)

বক্ষবন্ধনী বা কাঁচুলি নারীগণের বিশেষ পরিধেয় । রূপরামের কাব্য 'জামতি পালায়' বারুই বৌয়ের কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ পাই–

বিচিত্র কাঁচলিখানি বিশেষ লিখন।
দেখিয়া বারুই বৌ হরষিত মন॥" (রূপরাম/১৫২)

কলিঙ্গা যুদ্ধ যাত্রাকালে কাঁচু লি পরিধান করে নিজেকে আঁটসাট করে তোলে। যেমন–

"বুকে বাঁধে কাঁচুলী কবরী মাত্র কেশে।
তরবড়ি কোমর কসুনি করে শেষে॥" (ঘনরাম/৬৪০)

পুরুষের পোশাক মূলত ধুতি, জামা. ইজার ইত্যাদি। তাছাড়া শীতবস্ত্র চাদর ব্যবহার করা হত। রঞ্জাবতী যখন পুত্র কামনায় চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবায় গিয়েছিল তখন অন্যান্য পুরুষগণ ধুতি পরিধান করেছিল—

"যৌত ধুতি পরি সবে উঠিল আড়াতে।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে নাচে বেত্র হাতে॥" (ঐ/৯৩)

পুরুষরা উর্দ্ধাঙ্গে জামা পরিধান করত। ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় কলিঙ্গা যুদ্ধ যাত্রাকালে পুরুষের বেশ ধারণ

করলেও পুরুষের পোশাক জামা পরতে রাজী হয়নি—

"মনে নিল সার যুক্তি বলিলে কানড়া।
কিন্তু বুন কখন না পরি জামাজোড়া ॥" (ঐ/৬৪০)

তারা নিম্নাঙ্গে ইজার পরিধান করত—

"তরবড়ি সাজে রামা রাহুতের বেশে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে ॥" (ঐ/৬৫১)

দরিদ্র নারী ও পুরুষরা সাধারণত ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিত, গায়ের কাপড়ও ব্যবহার করত। শৌখিন পোশাক ধনীর প্রাচুর্য এবং ছেঁড়া কাঁথা, চাদর বা গায়ের কাপড় ইত্যাদি দারিদ্র্যের পরিচায়ক। দরিদ্র সোম ঘোষ বাজারে ভিক্ষা করত, সে বসনবিহীন, তার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা মাত্র-

"বাজারে মাগয়ে ভিক্ষা সম্বলের তরে।
চালু কড়ি দেই কেহ দয়া অনুসারে ॥
বসনবিহীন ঘোষ ছিঁড়া কাঁথা গায়।" (রূপরাম/১৯)

গৌড়রাজ কর্ণসেনকে গায়ের কাপড় দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল এবং ময়নানগরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল-

"এত বলি দিল রাজা গায়ের কাপড়।
যাত্রা কৈল কর্ণসেন ময়নার গড় ॥" (ঐ/২৫)

পুরুষের মধ্যে জুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন—

"নাথা নুথা কিলে গুঁতা হিড়িক জুতার।
ভাট বলে মরি মরি গোপ বলে মার ॥" (ঘনরাম/৬৩)

রাজপুরুষেরা পাগড়ী, কোমরবন্ধ, টুপি ও বিভিন্ন ধরনের আঁটসাট পোশাক পরিধান করত। সৈনিকরা যুদ্ধ যাত্রাকালে কোমরে পেটি বা কোমরবন্ধ, পাগড়ী, সরবন্দ বা শিরস্ত্রান পরিধান করত। কানাড়া যুদ্ধ যাত্রাকালে এ ভাবে সুসজ্জিত হয়েছিল—

"পরিপাটী পেটী আঁটি পাগ পরিসরে।
সম্মুখে সাজায়ে বস্ত্র দাসী ধরে করে ॥
শিরে বান্ধে সরবন্দ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা ॥" (ঐ/৬৫১)

বিবাহ, উৎসব-অনুষ্ঠানে পাগড়ী সম্মানসূচক উপহার দেওয়া হত, কিংবা বিবাহকালে পাগড়ী পরিধান করার রীতি ছিল। ঘনরামের কাব্যে কানড়ার বিবাহে কালুবীরকে পাগড়ী উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল—

"বীরে করি বক্সিস আনাল মহীপাল।
পূরট পাগড়ী জোর জরি পট্টশাল ॥" (ঐ/৪৭১)

পাগড়ীর সঙ্গে থাকত জরি বাঁধানো। সৈন্যসামন্তরা, রাজপুরুষররা টুপি পরিধান করত। তাতে নানা রকম মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত থাকত। কানড়া যুদ্ধ যাত্রাকালে সুবর্ণ টুপি পরিধান করেছিল—

"শিরেতে সোনার টুপি টেয়া বাঁধা তায়।
সাজ করে সীমন্তিনী রাণীকে সাজায় ॥" (ঐ/৬৫১)

রাজপুরুষরাও টুপি পরিধান করত এবং টুপি তাদের বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ গণ্য হত—

"মল্লডোরমণ্ডিত মাথায় বীরটুপি।
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি ॥" (ঐ/১৪২)

সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক কৃচ্ছ সাধন করত। তারা খুব সাধারণ পোশাক পরিধান করত। তাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধুতি; তাছাড়া নামাবলি গায়ে ব্যবহার করত, পায়ে কাঠের খড়ম এবং গলায় পৈতে ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরে আসে অলঙ্কার ও প্রসাধনদ্রব্যের কথা। বাঙালী চিরকালই অলঙ্কার প্রিয়। অলঙ্কারপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শখ-শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসীর অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় আছে। ধর্মমঙ্গলে বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের পরিচয় পাই, তবে লক্ষণীয় বিষয়, এর মধ্যে দিয়ে সেকালের ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানগত দিকগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অংশে অভিজাত রাজবংশের লোকেরা, অর্থশালীরাই বিভিন্ন রকম অলঙ্কার ব্যবহার করেছে কিন্তু রাঢ়ের আদিমতম বাসিন্দা কালু, লখ্যা, সনকারা নিরলঙ্কার। ধর্মমঙ্গলে যে সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় পাই সেগুলি হল— অঙ্গুরী, কঙ্কণ, শঙ্খ বা শাঁখা, পাসুলি, বউলি, পলা, রুলি, বাজুবন্দ, মদনকড়ি, হার ইত্যাদি। রূপরামের কাব্যে বাঙালী ব্যবহৃত অলঙ্কারের সুন্দর উল্লেখ পাই। রূপরামের কাব্যে আখড়া পালায় দেবী পার্বতী লাউসেনকে ছলনা করার আগে লাসবেশ ধারণ করে তার কিছু অংশ—

"নানা অলঙ্কার পরে সিন্দূরে মাজিয়া।
লক্ষেশ্বরী হার গলে দিলেন তুলিয়া॥
পাশুলী বাউলি পলা দোসতি তেসতি।
রসকাঠি পরে কত তাহার সংহতি॥
উপরে তেসতি তার করে কেয়াপাতা।
স্থির হয়্যা ঐমনি বসিলা জগন্মাতা॥
নাসিকা শিখরে মণি পবন হিল্লোল।
চাঁদমণি চকোর হাসিয়া মাগে কোল॥
দুই হাথে পরে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আগু করে রাঙ্গা রুলি সুবর্ণ কঙ্কণ॥
শঙ্খের উপর বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া।
নাপান করিতে চান দিয়া হাথ নাড়া॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি।
কৌতুকে পরিল দেবী অপূর্ব কাঁচলি॥" (রূপরাম/৯৭)

নারীরা কানে কুণ্ডল ও নাকে বেশর পরত—

"কানে পরে কুণ্ডল কনককাটা কড়ি।
পরিল বেসর নাকে বেশ হইল বড়ি॥" (ঘনরাম/১১০)

আবার ঘনরামের কাব্যে 'কানড়ার স্বয়ম্বর পালা'য় কানড়ার সাজসজ্জায় বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। যেমন—

"কন্যার কারণে দিল কত অলঙ্কার।
হীরা মণি মুকুতা মণ্ডিত হেমহার॥
কনককিঙ্কিণী কত কঙ্কণ কেয়ূর।
সুচিত্র সুন্দর ধূপ সুরঙ্গ সিন্দূর। (ঐ/৪১৫)

বিবাহকালে নানা রকম অলঙ্কার বা গহনা যৌতুক দেওয়া হত। পার্বতী কানড়ার বিবাহে অঙ্গুরীয় যৌতুক দিয়েছে-

"ভবানী যৌতুক দিল মাণিক অঙ্গুরী।
হাথে হাথে সঁপি দিল কানড়া সুন্দরী॥" (রূপরাম/২৫৯)

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা— তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, কুমকুম, কাজল, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলের 'আখড়া পালা'য় দেবী ভবানীর রূপচর্চার প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য–

"নয়নে অঞ্জন দিল কপালে সিন্দূর।
দরশনে রবির কিরণ গেল দূর॥
তার কোলে দিল যদি চন্দনের রেখা।
প্রথম উদয় যেন কুমুদের সখা॥
কজ্জলের বিন্দু কিবা দিল তার কোলে।
নব জলধর ছটা বিষ্ণুপদতলে॥" (ঐ/৯৭)

বাঙালী নারীরা চোখে কাজল ব্যবহার করত—

"কজ্জলে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন।
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরণ॥" (মানিকরাম/৪০০)

বাঙালী নারীরা আমলকি , হরিদ্রা, চুয়া চন্দনে অঙ্গ মার্জ্জনা করত, তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার তেল, গন্ধদ্রব্য, অগুরু ইত্যাদি ব্যবহার করত। নারায়ণ তেল মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত একটি গন্ধ তেল; প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই নারায়ণ তেল ব্যবহারের কথা পাই। বাঙালী অভিজাত ঘরের রমণীরা প্রসাধন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যেমন রঞ্জাবতীর লাসবেশ ধারণকালে সজ্জা—

"বয়স-গরবে বেশ নানা পরিপাটি।
সমুখে যোগায় দাসী সিন্দূরের বাটি।
নারায়ণ তৈল চুয়া চঞ্চল চিরণি।
অলঙ্কার বসন গলায় গজমণি॥
লাসবেশ করে রঞ্জাবতী বিদ্যাধরী।
কুন্তলে চিরণি দিয়া বান্ধিল কবরী॥
রসের থোপনা দিয়া বান্ধিল সুন্দর।
প্রফুল্ল সুবর্ণ চাঁপা তাহার উপর॥" (রূপরাম/৭০)

বাঙালী রমণীগণ নানা ছাঁদে বেণী, খোঁপা বা কবরী নির্মাণ করত। কবরীতে জড়াত নানান সুগন্ধি ফুলের মালা, তাছাড়া বাঙালী রমণীগণ ফুলের মালা ও পাতার নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করত। রূপরাম, ঘনরাম ও মানিকরামের কাব্যে এরকম বিবরণ পাই। যেমন—

"আঁচাড়িয়া চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনি॥
কবরী মণ্ডিত মাল্যে মনোহর ফুলে।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রম অলিকুলে॥
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারা গায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা॥
দোসূতি তেসূতি পুঁতি হেম কণ্ঠমাল।

কিয়াপাতে গলায় গরব করে ভাল॥

.....

রতন মুকুরে রাণী দেখে মুখছবি।

কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি॥" (ঘনরাম/১১০)

কেশ বিন্যাস ও প্রসাধনের অন্যতম উপকরণ হল আয়না, চিরুণী। যেমন মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে 'বারুইপাড়া পালা'য় নয়ানী নাম্নী নারীর সাজসজ্জার বিবরণ–

"চিরুনীতে চিরিয়ে চিকুর বন্ধ কৈল।

তেহেরি চাঁপার মালা তায় বেড়াইল॥

মুকুর হেরিয়ে করে মুখের মার্জন।

সুভালে সিন্দুর ফোটা সুরঙ্গ শোভন॥" (মানিকরাম/২২৮)

সাজসজ্জার উপকরণ টোপর বা মুকুট নির্মাণ একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। কারুকার্যময় সোনার টোপর ছাড়াও শোলার তৈরী টোপর বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত। দরিদ্ররা সোনা-রূপা মণিরত্নময় অলঙ্কার-গহনা ব্যবহার করতে পারত না। তারা মূলত ফুল, পাতা ও শোলার অলঙ্কার ব্যবহার করত। যেমন ভাজন বুড়ির সাজসজ্জার জন্য গঠিত অলঙ্কারের বিবরণ—

"নিজালয়ে মালিনী শোলার ঝাঁপা গড়ে।

হেন বেলা ভাজনবুড়ী পায় গিয়া পড়ে॥

... ...

একে সে মালীর মেয়্যা তায় দিল কড়ি।

শোলার গঠন দিল অলঙ্কার চুড়ি॥

ধরিল কমল করে কাতা খরসান।

ধীরে ধীরে শোলা গড়ে কুন্দের নির্মাণ॥

টাড় বালা পাসুলি বউলি করে সজ।

গড়িল শোলার শঙ্খ সাক্ষাত কবজ॥" (রূপরাম/১৬৩)

মধ্যযুগে এক শ্রেণীর নারীর স্থূল রুচি ও বিকৃত সাজসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। অধোপথগামী দরিদ্র নারীরা বিকৃতভাবে সেজে দেহ ব্যবসায় নেমে যেত। ভাজন বুড়ি ধর্মমঙ্গলের একটি চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধার ইতরতা প্রকাশিত। ঘনরাম লিখেছেন—

"মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আচ্ছা।

উলুবন হতে যেন বার হল পেঁচা॥" (ঘনরাম/২৮৪)

আবার কালু ডোম, তার স্ত্রী সনকা ও লখ্যা ডোমনী, কিংবা শাকা-শুখার স্ত্রীদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ, কবি সাধারণভাবেই সে বর্ণনা করেছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধনের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একটি লোকায়ত দিক আত্মপ্রকাশ করছে।

বাদ্যযন্ত্র ঃ বাদ্যযন্ত্র বাঙালীর সংস্কৃতি তথা সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়েছে তার তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। ধর্মমঙ্গলে বোধহয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সব চাইতে বেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র বা 'তত', চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র বা 'আনদ্ধ', ধাতু বা বাঁশ নির্মিত ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বা 'সুষির' এবং ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বা 'ঘন' সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে ধর্মমঙ্গলে। ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল–সপ্তস্বরা, যন্ত্র, মাদল, মৃদঙ্গ, মুরজ,

কাড়া, পড়া, ঢাক, ঢোল, বীরকালী, ছাপড়, খঞ্জরী, কাহাল, মুহরী, সানাই, শঙ্খ, ভুরঙ্গ, তুরী, ভেরী, দামামা, শিঙ্গা, কাঁসি, মন্দিরা, খঞ্জ, মুচঙ্গ, ঝাঁঝড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে বোধ হয় দু'ভাবে দেখা যেতে পারে— উৎসব-অনুষ্ঠানে, যথা— বিবাহ, পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এবং যুদ্ধকালে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও যুদ্ধায়োজন ছাড়া আমোদ-প্রমোদে বাদ্যযন্ত্র ছিল অঙ্গ বিশেষ। নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে রাজসভা, দেবসভা, জনসভা উৎসব মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায় মধ্যযুগের কাব্যে। মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে হীরা নটিনীর নৃত্যগীত উল্লেখযোগ্য। রূপরামের কাব্যে দেবসভায় নর্তকী অম্বুবতীর নৃত্যগীতের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন—

"দণ্ডবত প্রণাম জুড়িয়া দুই হাত।
নাচিতে লাগিল নটী সভার সাক্ষাত॥
রূপ দেখ্যা মদন কোকিল করে চুপ।
বীণা রাখ্যা নারদ দেখিল তার রূপ॥
বাজে খোল করতাল মন্দিরা মধুর।
তালে মানে নাচে নটী চরণে নূপুর॥" (রূপরাম/১৫)

আবার ইছাই ঘোষের পার্বতী পূজায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় রোল।
শিঙা কাড়া কাঁসর দ্গাড় ঢাক ঢোল॥
কাঁসি করতাল বাঁশী মূরজ মাধুরী।
মৃদঙ্গ মাদল ডম্ফ জগঝম্প ভেরী॥
গমক খমক আদি শঙ্খ সপ্তসুরা।
মোহন মন্দিরা বাঁশী ডিণ্ডিম ঝাঝরা॥
সুপদ্য দুন্দুভি বাদ্য দেববাদ্য যত।
বেণু বীণা বিশাল বিনোদ বাদ্য কত॥
ঘোর ঘণ্টা করতাল সুরসাল বাজনি।
ডমুরীর শব্দ শিব শঙ্কর ভবানী॥" (ঘনরাম/৫১৪-১৫)

বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বাঙালী হিন্দুসমাজে একটি প্রাচীন রীতি। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে কলিঙ্গার বিবাহকালে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন কবি-

"খমক খঞ্জরি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল।
মার্দ্দল মরুজা বাজে মৃদঙ্গের বোল॥
সানি শঙ্খ মুচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণা বাঁশি।
কাঁসর দ্গাড় আর কাড়া পড়া কাঁসি॥" (মানিকরাম/৩৪৬)

কিংবা হীরা নটীর নৃত্য পরিবেশনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি উল্লেখযোগ্য, যেমন—

"নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা।
সুতান সুযন্ত্র সুচঙ্গ কর্যা॥
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘুনুনু বাজে।
অম্বুজলোচনে বঙ্কিম সাজে॥
খোল করতাল খঞ্জরী তুরী।

মুরুজা মঙ্গল ভুরঙ্গ ভেরী॥
বাজে অনিবার তাথেই নাদে।
রুনুনু ঝুনুনু নূপুর পদে॥" (ঐ/৩৬৩)

ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ও ঢোল পশুর চামড়া আবৃত বাদ্যযন্ত্র। বিবাহ, বিজয়- উৎসবে, পূজা-পার্বণে ঢাক ও ঢোল বাজানো হত। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন পশ্চিম উদয়ের জন্য শালেভর দিতে গেলে হরিহর বাইতিকে ঢাক বাজাবার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আবার মহামদের উদ্যোগে গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার আয়োজন করে তখন—

"নানা বর্ণে বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া বাজে রাত্রিদিনে॥" (রূপরাম/২৯৫)

শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে অতি পবিত্র। শঙ্খনাদের সঙ্গে বাঙালীর মাঙ্গলিক বিষয়ের সম্পর্ক। পূজা-পার্বণে, বিবাহে, নবজাতকের জন্মে শঙ্খধ্বনি করা মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হত। লাউসেনের জন্মকালে শঙ্খধ্বনি সহকারে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল—

"এত যদি বলিল দিনের দিবাকর।
ভূমিষ্ঠ হইল বালা তেজিয়া জঠর॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ময়না ভুবন।
সয়াল দেখিয়া শিশু জুড়িল রোদন॥" (ঐ/৭৬)

এছাড়াও বাঙালী সমাজে যে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল তা লক্ষ করা যায় ধর্মমঙ্গলে। তবে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধবিগ্রহকালে, বিজয় উৎসবে রণবাদ্য বাজানো হত। মঙ্গলকাব্যে প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র যুদ্ধযাত্রাকালে বা বিজয় উৎসবে বাজানোর কথা পাওয়া গেলেও রণবাদ্য হিসাবে মূলত কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা— ঢাক, ঢোল, দামামা, ভেরী, কাঁসি, রণদামামা, শিঙ্গা, রণশিঙ্গা, টমক, টেমাই, কাড়া, নাকাড়া, ধামসা, দুন্দুভি, ডম্বরু ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গল যেহেতু বীর রসের কাব্য তাই যুদ্ধবিগ্রহে ভরপূর। ঘনরামের কাব্যের 'পশ্চিম উদয় আরম্ভ' পালায় লাউসেনের চাঁপাই অবস্থানকালে মহামদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ময়নাগড় আক্রমণ করে। তারই চিত্র আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন প্রকার রণবাদ্য বাজানোর মধ্যে দিয়ে—

"পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে॥
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় শুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগড়ি সঘনে পড়ে কাড়া॥
ধাও ধাও ধামাসা দামামা দাম দুম।
শিকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম॥" (ঘনরাম/৫৮১-৫৮২)

সুতরাং বলা যায় বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে বাদ্যযন্ত্র সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ।

শিল্পকর্ম ঃ মানুষ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে আপন কার্যে লাগিয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন সৌন্দর্যঅন্বেষু মনের পরিচয় দিয়েছে তেমনি আপন প্রয়োজনকেও মিটিয়েছে। বাংলার শিল্পবস্তু, বাংলার কুটীরশিল্প বাঙালীর অহংকার। শিল্পকর্মের মধ্যে পড়ে যেমন— গহনা বা অলঙ্কার শিল্প, সূচী শিল্প, বাঁশ-বেত ও তালপাতার নির্মাণ কার্য, শোলার কাজ ইত্যাদি। কুটীরশিল্প হিসাবে গহনা শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অলঙ্কার প্রিয় বাঙালী সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা খচিত গহনা নির্মাণ করত। মঙ্গলকাব্যে বিচিত্র অলঙ্কারের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে

এই পরিচয় পাওয়া যায়। সূচীশিল্প বাংলাদেশে অতি বিখ্যাত ছিল, বাঙালী রমণীগণ সুঁই সুতার সাহায্য চিত্রবিচিত্র নক্শীকাঁথা নির্মাণ করত। সূচী কর্মের পরিচয় আছে দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ অংশে। শিল্পীরা রঙবেরঙয়ের সুতার সাহায্যে লতা-পাতা-ফুল-পাখি-জীবজন্তু এমন কি বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর ছবি আঁকত। এর মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।যেমন–

"কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥" (ঐ/১৫১)

গ্রামীণ বাঙালীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের কাজ করত, ডালা, কুলা, ধুচুনি, নির্মাণ করত। এগুলি নিশ্চয় শিল্পবস্তু হিসাবে গণ্য হতে পারে। কালু ডোমের ঘরের নারীরা ডালা, কুলা, ধুচুনি, শীতলপাটি, তালপাতার পাটি নির্মাণ করে। শোলার কাজ অন্যতম কুটীরশিল্প, অলঙ্করণযুক্ত শোলার টোপর, এমন কি গহনা তৈরীর কথা মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। এছাড়া ফুলের মালা, পাতার গহনা সাজসজ্জায় অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হত। এগুলিকেও শিল্পবস্তু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া তাঁতি বস্ত্র তৈরী করত। বাংলার ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটা হত, ভাজন বুড়ি চরকায় সুতা কাটত বলে উল্লেখ আছে। বাংলার তাঁতিদের তৈরী বস্ত্র কত উন্নত ছিল তার প্রমাণ আছে, ধর্মমঙ্গলে 'গুয়াবুটি' শাড়ীর উল্লেখ পাই, তার কোমলতা ও সূক্ষ্মতা সুবিদিত ছিল। কুমাররা মৃৎশিল্পে নিযুক্ত থাকত। বাংলার মৃৎশিল্পে পোড়ামাটির কাজ কত উন্নত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে রাঢ়বঙ্গও যে শিল্পকর্মে উৎকর্ষলাভ করেছিল ধর্মমঙ্গলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসি যানবাহনের কথায়। মধ্যযুগে বাঙালী সমাজে যে সমস্ত যানবাহন ব্যবহার হত তার মোটামুটি পরিচয় আছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। যাতায়াত ও পরিবহনের কার্যে যানবাহন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। মধ্যযুগে যানবাহন ব্যবস্থা ছিল একেবারেই অনুন্নত। প্রধানত পায়ে হেঁটেই মানুষ যাতায়াত করত। তাই আমরা দেখতে পাই লাউসেন কর্পূর সহকারে পায়ে হেঁটেই ময়না থেকে গৌড় এসেছে, ইন্দামেটে বা অন্যান্য দূতরা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেছে। পশুর পিঠে আরোহণ করে যাতায়াত করাও প্রাচীন পদ্ধতি, প্রধানত ঘোড়া, হাতি, মহিষের পিঠেই যাতায়াত ও মাল পরিবহন চলত। যুদ্ধযাত্রায় সৈনিকরা হাতি, ঘোড়া বাহন হিসাবে ব্যবহার করত। কামরূপে যুদ্ধ করতে গিয়ে কামরূপরাজের হাতি, ঘোড়া, উট, গাড়ি দেখে কালু ভয় পেয়েছে–

"কত ঠাঁই হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ী থানা।
কালু বলে কিরূপে কাঙুরে দিব হানা॥" (ঐ/৩৮০)

দূরবর্তী স্থানে গমন ও যুদ্ধযাত্রায় পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হত মধ্যযুগ ও অনেক আধুনিক কাল পর্যন্ত। যানবাহনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিলে দেখা যায়, স্থলযান ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, গরুর গাড়ী, রথ. দোলা বা চতুর্দোল বা পালকী এবং জলযান তরণী বা নৌকা, ডিঙি নৌকা, ভেলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। রূপরামের কাব্যে পাই রঞ্জাবতীর বিবাহের পর কর্ণসেন বলদ-শকট বা গরুর গাড়ী চেপে ময়নাগড় যাত্রা করেছে—

"বলদ-শকটে ধন নিলেক তুলিয়া।"
ধাইল দক্ষিণমুখে মেলানি মাগিয়া॥" (রূপরাম/৩৫)

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তের কাব্য ধর্মমঙ্গলেও রথের ব্যবহার দেখা যায়। ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে বর দিতে এসেছে রথে চড়ে—

"মনুহরে বর দিয়া ধর্মের পয়ান।
চাঁপাই-র সমুখে রাখিল রথখান॥" (ঐ/৬৩)

মঙ্গলকাব্যে যে যানটির ব্যবহার সবচাইতে বেশী সেটি হল দোলা বা চতুর্দোল ও পালকী। বেহারারা কাঁধে করে পালকী বা দোলা বহন করত, ধনীরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত এবং বিবাহে চতুর্দোল ব্যবহার করত। রূপরামের

কাব্যে দেখি কর্ণসেন ময়না থেকে গৌড় যাত্রা করেছে দোলায়- চেপে--

"গোউর শহরে যাত্যে বাড়াইল পা।
দোলার উপরে সেন হেলাইল গা॥" (ঐ/৩৭)

লাউসেন কলিঙ্গাকে বিবাহ করার পর চতুর্দোলে চড়ে দেশে যাত্রা করেছিল—

"দাসদাসী বেষ্টিত হরিষ হালাহোলে।
বরকন্যা চাপিয়া চলিল চতুর্দ্দোলে॥" (ঘনরাম/৪০৭)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলযান নৌকা বা তরণী এবং ভেলার ব্যবহার হত। নৌকা আবার দু'প্রকার হত—বড় নৌকা বা তরণী এবং ডিঙি। ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতী ও লাউসেন চাঁপাই যাত্রা করেছিল নৌকায় চেপে—

"সাবধানে তরণী বাহিল দারিকেশ্বর।
চাঁপাই ভুবনে পাইল এ দুই প্রহর॥" (রূপরাম/৫৫)

ঘনরামের কাব্যে ইছাই বধ করতে গিয়ে কালুর সঙ্গে লোহাটাবজ্জরের প্রথম সংগ্রাম হয়েছিল নৌকায়। ধর্মমঙ্গলে ভেলার ব্যবহার আছে। ইছাই বধ করতে গিয়ে কালু দুর্দান্ত অজয় নদ ভেলায় হেলায় পার হতে চেয়েছে—

"ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁফালে হব পার।" (ঘনরাম/৪৮৯)

আকাশযানের ব্যবহার মধ্যযুগে সম্ভবত ছিল না, কিন্তু কবির কল্পনায় আকাশযান অসম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের সাহিত্যে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবদেবীগণ সুদিব্য বিমানে আকাশ পথে চলাফেরা করত। এটা নিছক কবির কল্পনা মাত্র, বাস্তব নয়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ এবার আসা যাক্ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। বাঙালী চিরকাল অদৃষ্টবাদী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালী মাত্রই অদৃষ্টবাদী। ধর্মমঙ্গল কাব্য এই অদৃষ্টবাদী বাঙালী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেনের ধনেপুত্রে নাশ হয়, ফলে কর্ণসেন সংসার বিবাগী হয়ে পড়ে। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে প্রবোধ দেয় এই বলে—

"দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাহের ভিক্ষুক॥" (ঐ/৬৯)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরাজয়, অক্ষমতা, অকর্মণ্যতা মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে। ধর্মমঙ্গলে তাই দেখা যায় সর্বস্ব হারিয়ে বৃদ্ধ কর্ণসেন মনে করে—

"অসার সংসার দেখি কৃষ্ণ বড় ধন।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কিবা রাজসিংহাসন॥" (রূপরাম/৩০)

গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার ইত্যাদি চিরকাল বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক-অপৌরাণিক মিথ ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে রাঢ়বাসী বাঙালীর জীবন। বার দোষ. গ্রহ, নক্ষত্র, তিথিগত দোষ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল—

"মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশা দোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয়॥" (ঘনরাম/৬৮)

—এই দশা অবশ্য গ্রহের দশা। শনি গ্রহ সম্পর্কিত মিথ আমাদের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে সংস্কারগ্রস্ত করে তোলে। তাইতো দৈবের দোষে নদীর জল বাড়ে—"দৈববলে বাড়ে নদী কুলকুল শব্দে।" (ঘনরাম/৬৬)। আর মহামদ বহুকাল নদীর তীরে অবস্থান করার পরও নদীর জল না কমায় অমঙ্গল সূচক সিদ্ধান্ত করে। কবি লিখেছেন—

"উঠে এল মহাপাত্র ভাবি অমঙ্গল।" (ঐ/৮০)

তাছাড়াও আছে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার। সময় বিশেষে পশুপাখি দর্শন, পশুপাখির ডাক শ্রবণ শুভ বা অশুভ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। যেমন— যাত্রাকালে বা পথে চলতে মাথার উপর কালপেঁচা ডাকা, শৃগাল-কুকুর আর্তনাদ করা, শকুনি-গৃধিনী উড়ে যাওয়া এবং গায়ে পড়া, তারাখসা দেখা অশুভ। মহামদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিমূল রাজ্য আক্রমণ করলে ঐ সমস্ত কু-লক্ষণগুলি দেখতে পায় বলে তার যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। মানিকরাম লিখেছেন—

"পথে কত অমঙ্গল দেখে পৃথ্বীধর।
কাল পেঁচা ডেকে বুলে মাথার উপর॥
শৃগাল কুক্কুর কান্দে উভু করা্য গলা।
আচম্বিত খসিয়া পড়িল মেঘমালা॥
শকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে।
পাক মেরা্য পাখায় রাজার গায় পড়ে॥" (মানিকরাম/৩৭৭)

শুধু কি তাই, যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা অমঙ্গল; বাম দিকে কালসর্প দেখা, সম্মুখে আগুন জ্বলতে দেখা, ধোপাকে কাপড় ধুতে নিয়ে যেতে দেখা, চলতি পথে শৃগাল বাম দিক থেকে রাস্তা অতিক্রম করে ডান দিকে যাওয়া অমঙ্গলসূচক। ইছাই ঘোষ লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রাকালে নিম্নলিখিত অমঙ্গলসূচক চিহ্নগুলি দেখতে পায়—

"জাত্রাকালে য়মুঙ্গল পড়ে কত আর।
ঘরে হইতে বাহির হইতে মাথে ঠেকে চাল॥
বামে কালসর্প দেখে সমুখে য়ানল।
সন্যকুম্ভ দেখে বির যাত্রা য়মুঙ্গল॥
রজক ধুইতে বস্ত্র আগে লঞা যায়।
বামেতে শ্রীকাল আসি দক্ষিনে কাটায়॥
হেন সব য়মঙ্গল দেখে নিরন্তর।
কিছুই নাহিখ মানে ইছাই কোঙর॥" (ময়ূরভট্ট/৯৩)

সুতরাং ইছাই ঘোষের জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। পশুপাখির ডাক অনেক সময় মঙ্গল-অমঙ্গলকে বহন করে। লাউসেন, কর্পূর গাছতলায় রাত্রিযাপন করে শেষ রাতে অমঙ্গলসূচক কালপেঁচার ডাক শুনতে পায়—

"কাল পেঁচা ডাকে সব অবসান রাতি।
এহার লক্ষণ জানি লেই দণ্ড ছাতি॥" (রূপরাম/১৮২)

আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-কেন্দ্রিক সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল। যাত্রাকালে পুরুষের বাম অঙ্গ স্পন্দন এবং নারীর ডান অঙ্গ স্পন্দন অশুভ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এসবের প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধযাত্রার আগে শাকা-শুকার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়, তাই যুদ্ধে তাদের মৃত্যু হয়। নটী অম্বুবতী নৃত্যের জন্য দেবসভায় যাত্রাকালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটে—

"মাথায় ঠেকিল চাল ঘর বাহিরিতে।
বসন বাধিল পায় ডানি আঁখি নাচে।
নটী বলে আমার কপালে কিবা আছে॥" (ঐ/১৫)

আবার দেবতারাও মানুষের মত স্পন্দন চরিত্র মেনে শুভাশুভ বিচার করে, লাউসেনের বিপদের আগেই ধর্মঠাকুর অশুভ ইঙ্গিত পায়, তার বাম অঙ্গ নাচে—

"দশনে অধর কাঁপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি মনে মান ভঙ্গ॥" (ঘনরাম/৩২৫)

শুধুমাত্র এগুলিই নয়, মানুষকে কেন্দ্র করেও এ জাতীয় সংস্কার-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। যাত্রাকালে প্রজননে অক্ষম ব্যক্তি বা সন্তানহীন ব্যক্তির মুখদর্শন অশুভ বলে বিবেচিত হত, তাইতো ধর্মমঙ্গলে সকল পুত্রের মৃত্যুর পর কর্ণসেন আঁটকুড়া বলে চিহ্নিত হয়, রঞ্জাবতী আঁটকুড়া বদনাম ঘোচানোর জন্য ধর্ম উপাসনা করে। বলা চলে ধর্মমঙ্গলে এই বিষয়টি একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্রও বুঝতে পারে—

"আটকুঁড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায়।" (ঐ/২৯)

সকল পুত্রের মৃত্যুর পর কর্ণসেনের মনে হয়—

"কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী।
আঁটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী॥" (ঐ/৬৯)

বন্ধ্যা রমণী দর্শন এবং আঁটকুড়া পুরুষ দর্শন অশুভ বলেই মহামদ কর্ণসেনকে আটকুঁড়া এবং রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে গালি দেয়। কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে বলে—

"মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা॥" (ঐ/৮৪)

আবার সকলই অশুভ নয়, কিছু কিছু শুভকর সংস্কার-বিশ্বাস ছিল। মঙ্গলকাব্যে তার প্রচুর উল্লেখ আছে। যেমন পূর্ণকুম্ভ, সবৎসা ধেনু, পতিতা দর্শন পুণ্যকর্ম ও শুভজনক বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সুরিক্ষা তাই লাউসেনকে কামনা করলে লাউসেন বলে—

"দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহাপাপ॥
শ্মশানকুসুম সম বর্জ্জনীয়া বেশ্যে।" (ঐ/২৯২)

আবার দেখি, লাউসেন কর্পূরকে উপদেশ দিয়েছে—

"শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ভাই কহি সুপ্রলাপ।
নটিনী দরশনে পুণ্য গমনে সে পাপ॥" (মানিকরাম/২৪৯)

খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করার কথাও বাঙালী সমাজে সুলভ। মাস, বার, তিথি ইত্যাদি বিচার করে কোন্ কোন্ খাদ্য কখন ভক্ষণ করা উচিত তার নিয়ম সমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্মদেব রঞ্জাবতীকে পুত্রবর দেয়, কিন্তু লাউ ভক্ষণে নিষেধ করে—

"লাউ নাঞি খায়্য রঞ্জা লাউ নাঞি রুয়্য।
পুত্র হৈলে নাম তার লাউসেন থুয়্য॥" (রূপরাম/৬৬)

খাদ্যাখাদ্য ছাড়াও বিভিন্নক্ষেত্রে নানা সংস্কার ও বিধিনিষেধ পালিত হত, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এগুলি পালিত হত, মনে করা হত এগুলি যথাযথভাবে পালিত না হলে ক্ষতি হতে পারে।স্থানাশ্রয়ী বিশ্বাসও আছে; বাঙালী সমাজে দেবস্থান, তীর্থস্থানের অপার মহিমার কথা সুবিদিত। ধর্মমঙ্গলে দেখতে পাই ধর্মসেবকদের কাছে চাঁপাই অত্যন্ত পুণ্যস্থান। তাই বলা হয়েছে—

"তুমি এক মনে পূজা কর নিরঞ্জন।
তীর্থচূড়ামণি এই চাঁপাই ভূবন॥" (ঐ/৫৬)

গয়া ও কাশী বাঙালী হিন্দুর কাছে অতি পবিত্র স্থান, সেখানে পিণ্ডদান করলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি হয়, তাই ইছাই-র মৃত্যুর পর পার্বতী গঙ্গাসাগর সঙ্গমে অস্থি বিসর্জ্জন দেয়—

"দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে।

অস্থি পাঠাইলা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥" (ঘনরাম/৫৪৪)

গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার করে বাঙালী হিন্দুর কাছে গঙ্গাজল অতি পুণ্য ও পবিত্র ছিল। পূজা-পার্বণে তাই গঙ্গাজল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবার সময় শত ভার গঙ্গাজল নেয়—

"পুরট কলসে শত ভার গঙ্গাজল।
পূজা শেষে ভকিতা করিতে চায় ফল॥" (রূপরাম/৫৪)

শুধু কি তাই, গোবর পর্যন্ত পবিত্র বলে বাঙালী হিন্দুর বিশ্বাস। তাই পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সেই স্থান গোবর দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হত—

"কপিলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি।
তিন বার চন্দনের দিল ছড়া ঝাঁটি॥" (ঐ/৫৬)

আশীর্বাদ বা অভিশাপের কথাও বলা যেতে পারে। দেবতার আশীর্বাদ লাভের কামনা খুব স্বাভাবিক। দেবতার আশীর্বাদ, গুরুজনদের আশীর্বাদ পরম ফলদায়ক। পিতামাতা বাঙালীর কাছে দেবতুল্য বিবেচিত হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণও বাঙালী হিন্দুর কাছে দেবতুল্য। সুতরাং দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতামাতার আশীর্বাদ সন্তানের পরম কাম্য। কখনো সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে, কখনো পুত্রসন্তান, ধনসম্পদ লাভের জন্য, কখনো নীরোগ শরীর কামনা করে, কখনো এয়োতি লাভের কামনায় আশীর্বাদ করা হত। প্রসঙ্গত, এই জাতীয় বিশ্বাস যে বর্তমানে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে তা নয়।

বাঙালী হিন্দু সমাজে পতি নারীর কাছে দেবতুল্য, সুতরাং স্বামীর আজ্ঞাবাহী হওয়া নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তাই চাঁপাই যাত্রার আগে রঞ্জাবতী স্বামীর অনুমতি চেয়ে নিয়েছে—

"চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে।
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে॥" (ঘনরাম/৮৯)

পিতামাতা সন্তানের কাছে দেবতুল্য, আর তাদের আশীর্বাদ সন্তানের পাথেয়। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। তাই রঞ্জাবতী লাউসেনের গৌড় যাত্রাকালে আশীর্বাদ করে—

"আশিস করিনু আমি যদি হই সতী।
সতত করুন রক্ষা শ্রীধর্ম সারথি॥" (রূপরাম/১১৮)

দেবতার আশীর্বাদ চিরকাল কাম্য, মঙ্গলকাব্যের কবি দেবতার কাছে আশীর্বাদ কামনা করত, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে আশীর্বাদ কামনা করত। ধর্মমঙ্গলে সন্ন্যাসী মদনাকে আশীর্বাদ করেছে, যেমন—

"সন্ন্যাসী চরণ বন্দে লোটায়া অবনী॥
প্রভু কন পূর্ণ হকু মনের বাসনা।" (ঘনরাম/৩৫)

বাঙালী নারীর কাছে বৈধব্য যন্ত্রনা বিশেষ; তাই এয়োস্ত্রী থাকার কামনা সমাজমানসে নিহিত ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ এয়োতি কামনা করা হত, তাই কানড়ার বিবাহে চণ্ডী মাতৃভাবে কানড়াকে আশীর্বাদ করে। যেমন—

"আশিস্ দিলেন চণ্ডী বাড়ুক আয়ত।" (মানিকরাম/৪০০)

স্বামী স্ত্রীর নিকট গুরুজন, তাই স্বামী স্ত্রীকে আশীর্বাদ করতে পারে। কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে পুত্রবতী হওয়ার আশীর্বাদ করেছে—

"পুত্রবতী হও প্রিয়ে আশীর্ব্বাদ বলে।" (ঘনরাম/১০৫)

মানব জীবন নিরঙ্কুশ নয়, সুতরাং আশীর্বাদের পাশাপাশি অভিশাপও দেওয়া হত। কখনো স্বল্পায়ু জীবনের অভিশাপ, কখনো সবংশে নাশ হবার অভিশাপ দেওয়া হত। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের গোড়ায় এক জাতীয় অভিশাপ

কাজ করেছে। দেবসভায় অভিশপ্ত করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিয়েছে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী। ইহজীবন বিমুখ বাঙালীর কাছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পাপের ফল, তাই দেবতারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিত। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা এক অভিশাপের মতই। কৌলীন্য প্রথা শাসিত বাঙালী সমাজ বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা নতুন বিষয় নয়, তার ফলও ছিল বিষময়। তাই দেবী অম্বুবতীকে অভিশাপ দেয়—

"লাগিল দেবীর গায়ে চরণের জল।
অভিশাপ দেন মাগ পেয়ে এই ছল॥
.....
বুড়ী বলে আমায় করেছ উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বারমাস॥
এক জন্ম মরে দেখ পুত্রের বয়ান।
এত বলি ঈশ্বরী হইল অন্তর্দ্ধান॥" (ঐ/২১)

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংস্কার বিশ্বাস পালিত হত, যেমন— বাঙালী হিন্দু সমাজে ভাশুর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক নিয়ে, শাশুড়ী-জামাতার সম্পর্ক নিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পালিত হত। ভাশুর ও ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কে দেখা যায়, ভ্রাতৃবধূ ভাশুরের নাম গ্রহণ তো দূরের কথা মুখ পর্যন্ত দর্শন করত না; তার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য ছোঁয়া নিষিদ্ধ ছিল। দেবসমাজেও বাঙালী পালিত এই সংস্কার ছিল, তাই পার্বতী ব্রহ্মার জপমালা ও কাটারি দেখেই লজ্জায় পলায়ন করে—

"মালা দেখি চমকিত (হইল) হৃদয়।
বিস্ময় মানি (ঞা) চণ্ডি রাজার আগে কয়॥
আমার ভাসুর ব্রহ্মা তার জপ্য মালা।
সম্মুখে রহিল দেখ য়াগুলি দুআরা॥
কেমনে ছুইঞা মালা হৈব বাহিরে।
রাখিতে নারিল য়াজি কহিল তোমারে॥" (ময়ূরভট্ট/৩৬)

আবার ভাশুরকে দেখে ভ্রাতৃবধূ ঘোমটা দিত, জামায়ের সম্মুখে এলে শাশুড়ী স্বাভাবিক নয়, কাজেই জামায়ের সম্মুখে এলে শাশুড়ীকে ঘোমটা দেওয়াই বিধি ছিল। দেবী পার্বতী অপত্য স্নেহে কানড়াকে লাউসেনের সঙ্গে বিবাহ দেয়, সম্প্রদান করে শিবঠাকুর, তাই লাউসেন সম্পর্কে দেবীর জামাই। তাই লাউসেনকে দেখে দেবী হলেও সে ঘোমটা দিতে ভোলেনি—

"আমার জামাতা তুমি কানড়ার পতি॥
ময়নার লাউসেন জানিল মরমে।
মাথায় বসন দিল জামাতা ভরমে॥" (রূপরাম/২৯০)

আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও একটা নিষেধের বাতাবরণ ছিল, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে মাথায় ঘোমটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তাই পার্বতী শিবঠাকুরকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছে—

"শঙ্কর সমুখে দেবী লজ্জা পাল্য মনে।
হেঁটমুখে ঈশ্বরী বসিলা ততক্ষণে॥
মাথায় বসন দিল নিজ রূপ ধরি।" (ঐ/২৮৭)

স্বামী স্ত্রীর কাছে দেবতুল্য, সুতরাং স্বামীর নাম ধরা উচিত নয়। অনেক সময় শিক্ষিতা স্ত্রী বানান করে স্বামীর নাম বলত কিন্তু উচ্চারণ করত না, কিংবা প্রয়োজনে কাগজে লিখে জানাত। ধর্মদেব কলিঙ্গার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা

করলে কলিঙ্গা জানায়—

"বড়ই বিষম কর্ম্ম হইল এখন।
স্ত্রি হঞা স্বামির নাম করিব কেমন॥
জদি বা স্বামির নাম পুছিলা য়ামারে।
প্রবন্ধে য়ক্ষর তাতে কহিএ তোমারে॥
নোএ য়াকার মধ্যে উ সেন বোলান সেসে।
এই মোর স্বামির নাম সুনহ বিসেসে॥" (ময়ূরভট্ট/৮৪)

বাঙালী সমাজে বিশেষত নারী মহলে 'কিরাকাটা' বা দিব্য দেওয়া প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রঞ্জাবতী গৌড় থেকে প্রত্যাগত কর্ণসেনকে বিমর্ষ দেখে বলে—

"বিনয়ে বলিল রঞ্জা বেণুরায়ের ঝি।
আমার মাথার কিরা সমাচার কি॥" (রূপরাম/৩৮)

ঘনরাম অনুরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"বাঘ বধ সত্য হয় শিরে হাত দেও।
কিরা করি গিরা তবে আলাইয়া লও॥" (ঘনরাম/২৪৮)

অশিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে তুক্-তাক্, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, ঔষধীকরণ এসবের প্রতি এক জাতীয় সহজাত বিশ্বাস ছিল। এসবের মধ্যে দিয়ে বাঙালী সমাজের মৌল প্রবণতাটি বোঝা যায়। তন্ত্রচর্চা ও তান্ত্রিকতার প্রতি বিশ্বাসও মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে সুলভ ছিল। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে তান্ত্রিকতার একটা সম্পর্ক আছে। শুধু তাই-ই নয়, জাদুবিদ্যা ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বাঙালী আস্থাশীল ছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে এর প্রয়োগ পাই। ইন্দামেটে লাউসেনকে চুরি করতে ময়নাগড় গিয়ে মন্ত্র পড়ে তান্ত্রিকতার সাহায্যে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রূপকথার মধ্যে নিন্দালি দেওয়া বা ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করার কথা পাওয়া যায়। এই কাজে অবশ্য কিছু কিছু দ্রব্যগুণযুক্ত পদার্থ, শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা, মাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। নিদ্রালি লাগানোর অর্থ হল মন্ত্র দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করা। চোর, ডাকাতরা মন্ত্রপূত ইঁদুর-মাটি নগরে ছড়িয়ে দিলে সেখানে যে যেই অবস্থায় আছে সে সেই অবস্থায় নিদ্রা যাবে এরকম বিশ্বাস ছিল। একার্যে এক জাতীয় মন্ত্রোচ্চারণ করা হত। মন্ত্রটি যে সকল সময়ে এক প্রকার হত তা নয়। অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হলেও দেবীর কাছে বর চেয়ে নেওয়া হত। দেখা যায় ইন্দামেটে লাউসেনকে চুরির আগে দেবী কালিকার পূজা করে বর চেয়ে নেয়—

"নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিদুটি।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি॥" (ঘনরাম/১২৫)

সুতরাং সে মন্ত্রপূত করে 'ইন্দুর-মাটি' ছড়ায়। এখানে ব্যবহৃত মন্ত্রটি বেশ মজার—

বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি।
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর॥
আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্রে নিদুটি॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীর ভাগ॥

খাটে বাটে ভূমে পড়ে যেজন ঘুমায়
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায়॥
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদুটি নয়নে তার লাগে॥
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কান্দুরে কামিক্ষাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায়॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে শহরে সবার উঠে হাই॥" (ঐ/১২৬)

রূপরামের কাব্যে ব্যবহৃত নিদালি মন্ত্রটি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র এবং দেখা যায় এখানে প্রয়োগগত কিছু কৌশলও আছে—

"পড়া মাটি সিঁদ্‌কাঠি যতনে লইয়া।
ময়না ঈশান কোণে উত্তরিল গিয়া॥
প্রথম নিন্দাটি দেই ময়না ভুবনে।
মহাবিদ্যা জপ করে হরষিত মনে॥
বাম হাথে নিল নিন্দা ইন্দুরের মাটি।
তিন বার পরশ করিল সিঁদকাঠি॥
... ...
শয়নে যেজন জাগে বস্যা যেবা খায়।
কালিকাদেবীর আজ্ঞা ধর গিয়া তায়॥
যুবতীর দুই চক্ষে দড় কর্যা ধর।
মনোজ-আগুনে তারা জাগে চারি পর॥
ইন্দুর-মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।
ময়নার ভিতরে পাড়িবে অঘোর ঘোর॥
ছ মাসের নিদ্রা যদি না আস্যে এথাই।
ভোজরাজার আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই॥" (রূপরাম/৮১)

মন্ত্রগুলির হয়ত কোন মূল্য নেই, কিন্তু প্রচলিত জলপড়া, তেলপড়ার মত মাটিপড়া এবং তার মন্ত্রোচ্চারণ লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বশীকরণ একটি বিশেষ তন্ত্রক্রিয়াগত সংস্কার; আসলে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসবের উৎপত্তি। বিবাহকালে জামাতা বশীকরণের ঔষধ করা একটি বিশেষ সংস্কার। কন্যার বিবাহে কন্যাকে অনিশ্চিত- অজানা জায়গায় পাঠানো হত সুতরাং কনের মাতা জামাতাকে বশীকরণের জন্য তুক্‌তাক্ করত আবার স্ত্রীও স্বামী বশীকরণের জন্য তুক্‌তাক ঔষধীকরণ করত যাতে স্বামী স্ত্রীকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখে। রূপরাম বর্ণনা করেছেন—

"আনিল মঙ্গল ঘট কুমারের বাড়ী।
বাড়ী বাড়ী তোলে শাক ব্যঞ্জন বেসারি॥
কেহ আনে গোমুণ্ড কাপাসবাড়ী হৈতে।
পাঁচ আয়ো জড় হয়্যা লাগিল পুতিতে॥
.....

অনেক রচিল রামা ঔষধ বিধান।
বিবাহ বাসরে বড় মায়্যার নাপান॥" (ঐ/২২৭)

দেখা যাচ্ছে বরকে বশীভূত করার ঔষধ কখনো পানের সঙ্গে, কখনো খাবারের সঙ্গে খাওয়ানো হত। কখনো চোখের কাজলে, কখনো বা চন্দনের ফোঁটায় ঔষধ দেওয়া হত। এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। বাঙালী সমাজে শাশুড়ী, ননদ, সতীনের সঙ্গে নববধূর সম্পর্ক খুব ভাল থাকত না। সুতরাং কন্যা পীড়নের হাত থেকে রক্ষার জন্যই ছিল কন্যাপক্ষের যাবতীয় আয়োজন। রঞ্জাবতীর বিবাহে মন্থরা ঔষধ করলে রঞ্জার দিদি ভানুমতী জানায়—

"মন্থরা জননী যত্নে আনিল ঔষধি।
রাণী ভানুমতী রাখে মায়েরে প্রবোধি।
কি কাজ ঔষধি আর ঐ একেশ্বরী।
ননদী সতিনী সতা কেহ নাই অরি॥
এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি।
কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি॥" (ঘনরাম/৭৬)

সমাজের মূল প্রবণতাটি কিন্তু এখানেই। বিবাহ সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধি নিষেধ ছিল, যেমন পৌষমাস, চৈত্রমাস ও ভাদ্রমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, মলমাসেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া মৃতের অশৌচ নিবারণ না হলে বিবাহ হত না, এমন কি মৃত্যুর এক বৎসর কালের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ বলে প্রচলিত ছিল। ঘনরামের কাব্যে কলিঙ্গার বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনরা কাঙুররাজকে বলেছে—

"বিবাহ মঙ্গলময় তাহে মহা দুঃখোদয়
মহাশয় কি করি বিধান॥
জ্ঞাতি বন্ধু রণে নাশ অশৌচান্তে পৌষ মাস
অদ্য অতিচারি বৃহস্পতি।
শুক্র অস্ত বাল্যবৃদ্ধি গুর্ব্বদিত্য কালাশুদ্ধি
পরে মলমাস কাল গনি॥
বৎসর বিরাম কর নহে নিবেদন ধর
কর কিছু ইহার উপায়।" (ঐ/৩৯৬)

কলিঙ্গাও পিতাকে এরকম উপদেশ দিয়েছে—

"বৎসর অশুচি তুমি শাস্ত্রের লিখন॥
খুড়া জেঠা তোমার মরিল কত রণে।
ইথে কন্যাদান তুমি করিবে কেমনে॥
সপিন্ড নাহিকদিলে বৎসর অশুচি।
মাছি পোক ডাঁশ যেন পুতিগন্ধ রুচি॥" (রূপরাম/২২৫)

এরকম হাজার নিয়ম, সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ।

অতঃপর আমরা আসছি আচার-বিচারগত বা লোকঅনুষ্ঠানগত অনুষঙ্গের মধ্যে। ধর্মমঙ্গল রাঢ়বঙ্গের কথা হলেও কাব্যে এখানকার স্থায়ী বসবাসকারীদের ঐতিহ্যকথা তেমন স্থান পায়নি, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যশাসিত আচার-অনুষ্ঠানই রাঢ়বাসী বাঙালীর সামাজিক জীবনকে পরিচালিত করেছে। বাঙালীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত। ধর্মমঙ্গলে কবিগণ তা আপন সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে বলা যাক, নবজাতকের জন্য সংক্রান্ত আচারগুলির কথা। প্রসূতির গর্ভকালীন অবস্থায়

কিছু আচার পালিত হত, যেমন—পঞ্চামৃত সেবন, সাধভক্ষণ ইত্যাদি। প্রসূতির গর্ভকালীন অবস্থায় প্রথমে অনাগত সন্তানের মঙ্গলের জন্য পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হত। দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি এই পাঁচ প্রকার খাদ্যই হল পঞ্চামৃত। এই লোকঅনুষ্ঠানে প্রসূতিকে বস্ত্র, অলঙ্কার উপহার দেওয়া হত। যেমন, রঞ্জাবতীর গর্ভকালে পঞ্চামৃত খাওয়ানোর কথা পাওয়া যায়—

"বস্ত্র অলঙ্কার ভূষা দিবসে দিবসে।
পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চমাসে॥" (ঐ/৭৫)

ছয় মাসে শিশু পূর্ণ শরীর পায় এবং তখন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সুতরাং তখন নানাবিধ আচার পালিত হত। অনুষ্ঠানটি লোকাচার হিসাবে 'সাধভক্ষণ' নামে পরিচিত। সাধারণত প্রসূতির সাত মাস গর্ভকালে সাধভক্ষণ করানো হত এবং সেইসঙ্গে নানা রকম উপহার দেওয়া হত——

"ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশ।
নানা সাধ খায় রামা অপূর্ব সন্দেশ॥
....
মনে যত আছিল খাইল সব সাধ।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বিলায় অবাধ॥" (ঐ/৭৫)

নবজাতকের জন্মের পর কতকগুলি আচার পালিত হত। অনুষ্ঠানগুলি ক্রমপর্যায়ে নাড়িকা ছেদন, পাঁচুট্যা, ষেটেরা বা ষষ্ঠীপূজা, আটকলাই বা আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ইত্যাদি। নবজাতকের জন্ম কালে দাইদের তৎপর ভূমিকা থাকত, তারাই মূলত জন্মকালে প্রসূতির পাশে থাকত। জন্মকালে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হত, আর দাই নবজাতকের নাড়ীচ্ছেদ করত। যেমন, রঞ্জাবতীর জন্মকালে—

"দূর্বা ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আচরণ।
সরসীর নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন॥" (ঐ/১৬)

জন্মের পর পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান 'পাঁচুটা' বা 'পাঁচ উঠানি' এবং ছয় দিনে 'সূতিকাষষ্ঠী' বা 'ষেটেরা', আবার কোথাও বা একুশ দিনে 'অরণ্যষষ্ঠী' পূজা করা হত। যেমন রঞ্জাবতীর জন্মকালে পালিত আচারগুলি হল—

"কুলক্রিয়া সকল সাধিল কুলবতী।
ছয় দিনে ষাটেরা পূজিল দিবারাতি॥
ষষ্ঠীপূজা করিলেক একুইশ দিবসে।" (ঐ)

আট দিনের অনুষ্ঠান 'আটকৌড়ি' ; ঐ দিন আট রকমের কলাই ভাজা ও মিষ্টি বিতরণ করে শিশুর মঙ্গল কামনা করা হত, আর নয় দিনে 'নত্তা' পালিত হত। আট দিনে কোথাও ষষ্ঠীপূজা করা হত, আসলে অঞ্চল বিশেষে আচারের এরকম হেরফের ছিল। মানিকরামের কাব্যে পাই—

"সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষষ্ঠীপূজা ।
নত্তা কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা॥" (মানিকরাম/৩২)

এরপরে নবজাতকের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ। সাধারণত ছেলের অন্নপ্রাশন ছয় মাসে এবং মেয়ের অন্নপ্রাশন সাত মাসে করার বিধি ছিল। তাই দেখা যায় হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্রের অন্নপ্রাশন হয় ছয় মাসে—

"লয়ে পুরনারীগণ আনন্দ আবেশে।
অরণ্যষষ্ঠীকে পূজে একুশ দিবসে॥
ষষ্ঠ মাসে শশিগুভে সুতিথিএ সাথ।
আত্মজে ওদন দিল অমরার নাথ॥" (ঐ/৫৮)

আবার রঞ্জাবতীর অন্নপ্রাশন সম্পর্কে লিখেছেন—

"সাত মাসে সুদিন করিএ শুক্লপক্ষে।
দিলেক ওদন রাজা দুহিতার মুখে॥" (ঐ/৩২)

শিশু সম্পর্কিত অনুষ্ঠান হল 'হাতেখড়ি'। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যারম্ভ করা হত—

"পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত হত্যে শুচিপক্ষে।
বিদ্যারম্ভ বালকের কৈল উক্ত ঋক্ষে॥" (ঐ/৫৮)

যৌবনকালের অর্থাৎ মানব জীবনের মধ্য পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবাহ। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কিন্তু ডোম সমাজের বিবাহাচারের কথা বলেননি, উচ্চবর্ণের বাঙালী সমাজের বিবাহাচার বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ক্রমিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহাচার পালিত হয়েছে, যেমন গায়েহলুদ, অধিবাস, মঙ্গলসূত্র বন্ধন, নান্দীমুখ, ক্ষৌরকর্ম বা বরকনে কামানো, বরবরণ, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান, বাসর যাপন, শয্যা তুলুনি এবং পরদিন বাসিবিয়ে, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, কালরাত্রি, ফুলশয্যা ইত্যাদি। অঞ্চল বিশেষে এই আচারসমূহ পালনে কিছুটা পার্থক্য ঘটে থাকে। প্রথমে পাত্রের গৃহে অধিবাস, পরে হলুদ মাখানো সূত্র বন্ধন এবং তারপরে পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদলাভের জন্য নান্দীমুখ করা হত। কন্যাগৃহেও এ সব অনুষ্ঠান চলত। কবি এ সব আচারের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন কলিঙ্গার বিবাহ উপলক্ষে গাত্রহরিদ্রা দিয়ে বিবাহের সূত্রপাত—

"সখীগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।" (ঘনরাম/৭৩)

এরপরে— "কাঙুর অধিপতি আনন্দে পূর্ণ মতি বান্ধবে দিল নিমন্ত্রণ।
সারথি সভাজন আগত নিকেতন আনন্দে হরষিত মন॥
টাঙ্গাইল দিব্য চান্দা মাণিক হেম বান্ধা বসিল যত দ্বিজগণ।
ভূপতি অভিলাষে কন্যার অধিবাসে কৈল দিব্য আরম্ভন॥
হরিদ্রাযুত বাস তিমির করে নাশ বরণ জিনি কাচ সোনা।
কলিঙ্গা অভিলাষে পিতার বামপাশে বসিল সুমতি ধারণা॥
অবনী গন্ধ শিলা স্বস্তিক পুষ্পমালা কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি।
যাবক গোরোচনা ধান্য রূপা সোনা হরিদ্রা দিল যথাবিধি॥
প্রশস্ত পাত্র করি তুলিয়া অধিকারী কলিঙ্গা করিল বন্দনা॥
পরশে তিন বার অসিত মণিহার সজল দীপ পরশনা॥
দুহিতা বিদ্যমান নিছনি পেলে পান বনিতা জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল সূত্র করে কনক সীথি শিরে বান্ধিল যত দ্বিজমণি॥
আনন্দে মহারাজা মাতৃকা করে পূজা ঘৃতে দিল বসুধারা।
নান্দীমুখ আদি করিল যথাবিধি হইয়া শুভ কাম্যতরা॥
সফল বিধি কিবা কলিঙ্গার অজি বিভা আনন্দে নাচে মহাশয়।
কৌতুকে রাজরাণী আইয় সভে আনি ঘরে ঘরে জল সয়॥" (রূপরাম'২২৬)

'জলসওয়া' বাঙালীর বিবাহে একটি বিশেষ স্ত্রীআচার। সাধারণত এয়োস্ত্রীরা পাড়া প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে জলসইতে যেত. বরণ ডালা সাজাত। বরণ ডালায় থাকত বিবিধ উপকরণ, যথা— পান. সুপারি, আমলকি, গোরাচনা, ধান. দূর্বা, কাজল. প্রদীপ ইত্যাদি। এদিকে বর গৃহে এলে বরকে বরণ করে নিত কনের মাতা। যেমন-

"সমুখে উত্থান ডালা ধরিল কিঙ্করী।

বরেরে বরণ করে রাজার সুন্দরী॥
মোহন মুকুটে রাণী দিল দূর্বা ধান।
চরণে ঢালিল দধি অসিত সমান॥" (ঐ/২২৭)

এর মাঝখানে বরকে আশীর্বাদ করা হত, যৌতুক দেওয়া হত এবং জামাই বশীকরণের ঔষধ করা হত। এরপরের অনুষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ— বর ও কনেকে ছাদনা তলায় আনা এবং তারপর বিবাহের মূল অনুষ্ঠান সাতপাক, শুভদৃষ্টি ও সম্প্রদান—

"সাজায়ে সাতাস কাটি সর্ব্ব সখী লয়ে।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা॥
দুহাতে ঘুরায় পান লাজে অধোমুখী॥
বসনে বরের মুখ ঢাকে যত সখী॥
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পাশরিয়া হাত॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভ হাত তুলি।
বরে ফেলাইয়া মারে সগুড় চাউলি॥
চারি চক্ষে চঞ্চল চাহিল কন্যাবরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে॥" (ঘনরাম/৪০০)

কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদান করে এবং যৌতুক প্রদান করত। বর কনের সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে দিত এবং তারপর গাঁট ছড়া বেঁধে দেওয়া হত। এরপর অগ্নি সাক্ষী রেখে হোম বা যজ্ঞ সম্পন্ন করে বিবাহ সম্পন্ন হত। ঘনরামের বর্ণনানুসারে—

"বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া॥

.....

সায় হল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিন্দুর॥
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বাঁধে গাঁটছড়া॥

....

ল্যাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী॥" (ঐ/৪০১-৪০২)

বিবাহ সম্পন্ন হলে ভোজন শেষে বর ও কনে বাসরযাপন করত —

"ক্ষীরখণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে॥" (ঐ/৪০২)

বিবাহের পরদিন বর কনের 'শয্যাতুলুনি'। নব দম্পতির জন্য রচিত শয্যাতোলার জন্য এয়োগণ 'শয্যাতুলুনি' বা

শয্যাতোলা দক্ষিণা আদায় করত—

"যুবতী মাগিল শয্যাতোলা বাসঘর।
শতেক কাহন আজ্ঞা দিলা নৃপবর॥" (রূপরাম/৩৫)

এরপর বাসিবিয়ে, বধূবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি ক্রমান্বয়ে পালিত হত। রাঢ়বঙ্গের বিবাহ আচারে বোধ হয় বাসিবিয়ে হত না, তাই ঘনরাম, রূপরাম, মানিকরাম কেউই বাসিবিয়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেননি। অবশ্য এসব পাত্রপক্ষের অনুষ্ঠান। বিবাহ এখানেই শেষ হত না। পাত্রগৃহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বধূবরণ করে নেওয়া হত এবং আট দিন পর বরকনে 'অষ্টমঙ্গল' করে তবে বিবাহ সমাপ্ত হত—

"আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হবো বাড়ী॥" (ঘনরাম/৪০২)

বাঙালীর বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তবে তা এখনকার মত এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেনি। ধর্মমঙ্গলে দেখতে পাই প্রত্যক্ষভাবে কোথাও পণের প্রসঙ্গ আসেনি, তবে বরপণ হিসাবে জামাতাকে প্রচুর যৌতুক দেওয়া হত। কাঙুররাজ লাউসেনকে বিবাহে কি কি দ্রব্য উপহার দিয়েছিল তার বিবরণ ধর্মমঙ্গলে পাই। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো দাসদাসী পর্যন্ত যৌতুক হিসেবে দেওয়ার রীতি ছিল-

"জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ।
বাস ভূষা বহু রত্ন বিষয়ানুরূপ॥
কন্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন।
কালিনি পাখর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রৌপদী।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি॥" (মানিকরাম/৩৪৯)

মৃত্যু মানব জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করে। মৃত্যুতেও বাঙালী হিন্দু নানা আচার পালন করে থাকে। মৃত্যুর পর প্রথম কর্তব্য মৃতদেহ সৎকার করা। বাঙালী হিন্দু মৃতদেহ দাহ করত। দাহকার্যের প্রধান আচার মুখাগ্নি, মুখাগ্নির প্রথম অধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্র না থাকলে স্ত্রী এবং কখনো কখনো মা-ও মুখাগ্নি করতে পারত। ধর্মমঙ্গলে দেখি লাউসেনের কাটা মুণ্ড ভেবে মায়ামুণ্ডকে দাহ করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল লাউসেনের চার স্ত্রী, আবার অপুত্রক ইছাই ঘোষের মৃত্যুর পর তার দাহকার্য সম্পন্ন করে দেবী পার্বতী রূপিনী মাতা। সাধারণত হিন্দুর মৃতদেহ দাহ করা হত শ্মশানে, কোন নদীতীরে। সাধারণত কাঠের চিতায় শবদেহ স্থাপন করে অগ্নিকার্য করা হত, তবে ধনী ব্যক্তিরা চন্দন কাঠের চিতায় ঘি ঢেলে মৃতদেহ দাহ করত। কবির বর্ণনা অনুসারে—

"পদ্মা সনে অজয় তটেতে উপনীতা।
চন্দন কাষ্ঠেতে চারু বিরচিল চিতা॥
পাতায়্যা চামর তায় ঢেল্যা ঢেল্যা ঘি।
শুয়ায়্যা ইছাই অঙ্গে ঢেল্যা দি॥
দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে।" (ঘনরাম/৫৪৪)

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাঁ হাতে প্রদীপ নিয়ে পাঁচ বা সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করে উল্টোদিকে মুখ করে চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে হত এবং তারপর শ্মশান বন্ধুগণ চিতায় অগ্নিসংযোগ করত। কবির বর্ণনায়—

"বাম করে ব্যজন দক্ষিণ করে মুণ্ড।
পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড॥" (মানিকরাম/৪৩৫)

ইছাই ঘোষের চিতায় অগ্নিসংযোগ করে মাতা পার্বতী, সুতরাং সম্ভবত পুত্রের চিতায় অগ্নিসংযোগে মায়েরও

অধিকার ছিল—

"পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।
ইছায়ের অগ্নিকার্য করেন আপুনি॥
অজয়ার তীরে চিতা হইল নির্মাণ।
কঙ্কালমালিনী চণ্ডী করিলেন স্নান॥
মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।
নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছা ঘোষে॥
কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে।
তথাপি ইছার আস্থি দেন গঙ্গাজলে॥" (ঐ/৪৬৬-৪৬৭)

মৃতদেহ সৎকার করার পর মৃতের অস্থিভস্ম গঙ্গাসাগরে বা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়া বিধি ছিল। গয়ায় পিণ্ডদান না করলে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয় না এই বিশ্বাসে দেবীও ইছাই ঘোষের আত্মার সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গমে অস্থি বিসর্জন দেয়—

"সাগর সঙ্গমে অস্থি রাখিল ভবানী।
গয়ামধ্যে সপিন্ডন করিল আপনি॥
তিল জলাঞ্জলি দিল ইছাইর নামে।" (রূপরাম/২৯১)

মৃৎদেহ সৎকারের পরবর্তী ক্রিয়া হল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত নানা বিধি প্রচলিত ছিল, য়েমন- তেরাত্রি শ্রাদ্ধ, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ, অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ এবং শেষে পিণ্ডদান ও তিলাঞ্জলি তর্পণ ইত্যাদি। কবির বিবরণ অনুসারে—

"ত্রিরাত্রি করিয়া মাতা রহিলা ঢেকুরে।
করেন চতুর্দ্ধা শান্তি চতুর্থ বাসরে॥
আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান।
প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিণ্ডদান॥
তবে দেন ত্রিয়াঞ্জলি তর্পণের জল।
ইছাই ঘোষের হল্য জনম সফল॥" (মানিকরাম/৪৬৭)

পুরুষের মৃত্যু হলে মৃতার স্ত্রীকে কিছু কিছু আচার পালন করতে হত। মৃতের স্ত্রীকে অর্থাৎ সদ্য বিধবাকে শেষ বারের মত সাজিয়ে দেওয়া হত। লাউসেনের মৃত্যুর পর তার চার স্ত্রী যে আচারগুলি পালন করে সেগুলি হল-

"কাঞ্চন কাকই কেহ দেই তার চুলে।
কেহবা তাম্বুল দেই বদনকমলে॥
জোড়হাথে কেহবা আশিস মাগ্যা লয়।
কান্দ্যা কান্দ্যা কপালে সিন্দুর কেহ দেয়॥
চারি সতী আনন্দে চড়িল চতুর্দোলে।
অনুমৃতা হত্যে যাম কালিনীর কূলে॥" (রূপরাম/২৭২)

সদ্য বিধবাকে শ্মশান যাত্রাকালে আম্রডাল ধারণ করতে হত এবং তারপর খই ছড়াতে ছড়াতে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হত—

"সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি শ্বশুরে।
আম্রডাল ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে॥" (মানিকরাম/৪৩৫)

কিংবা— "চন্দ্রমুখী কলিঙ্গা ছড়ায় খই কলা।

বাহিরিয়া দেখে লোক বিধাতার খেলা॥" (রূপরাম/২৭২)

শ্মশানে সদ্য বিধবার হাতের শাঁখা গুঁড়িয়ে দিয়ে সিঁথির সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং এরপর সতী রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করত।

বাঙালী সমাজের আচার-বিচারগতক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু নিয়ম পালিত হত। যেমন বাঙালী প্রাচীনকাল থেকেই অতিথিবৎসল। অতিধি বাঙালীর ঘরে দেবতার মত সম্মান পেত। হরিশ্চন্দ্র পালায় আমরা দেখি অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য হরিশ্চন্দ্র ও মদনা আপন পুত্রকে কেটে মাংস তৈরী করেছে। অতিথি দেবতা ছদ্মবেশী ধর্মদেবকে দেখে রাজা হরিশ্চন্দ্র—

"বিনয় বচন বলে বুকে জোড় হাত।
অপূর্ব্ব অতিথি দ্বারে দেবতা সাক্ষাৎ॥" (ঘনরাম/৩৫)

ঘরের অতিথি অভুক্ত রাখা পাপ, এ জাতীয় সংস্কার কাজ করায় অতিথিসেবা পরম ধর্ম বলে বিবেচিত হত। তাই অতিথি আগমন ঘটলে তাকে যত্নপূর্বক পা ধুয়ে দেওয়া কর্তব্য এবং তারপর পরিতোষ সাধন করা হত। রানী মদনা ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে অতিথি রূপে দেখে—

"রাজরাণী ঐমনি সম্ভ্রমে তোলে গা।
সেবিতে চলিল সেজ্যা সন্ন্যাসীর পা॥
হেম ঝারি পরিপূর্ণ জাহ্নবীর জলে।
কত নিধি চরণ নিছনি লয়্যা চলে॥" (ঐ)

সন্ন্যাসীঠাকুর, ওঝা, গণৎকার, দৈবাদেশ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর বিশ্বাস ছিল। দেবদেবীদের কখনো গণৎকার, কখনো দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ— সহজ সরল বাঙালী মনের অটুট বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। এ সব আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জাতি হিসাবে বাঙালীর স্বরূপ ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত। তাছাড়াও নানান পালা-পার্বণ, পূজা, বার-ব্রত ইত্যাদি বাঙালী জীবনের অঙ্গ। প্রসঙ্গত আসে উৎসবপ্রিয়তার কথাও। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গাপূজা। সাধারণ মানুষ দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেতে উঠত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় আছে—

"আশ্বিনে আনন্দ বড় সভাকার ঘরে।
দশভুজা দশদিগে বড় শোভা করে॥
মহা মহা পূজা করে কত ভাগ্যবান।
ছাগ মেষ মহিষ সহস্র বলিদান॥" (রূপরাম/৯৫)

পূজায় বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব ইত্যাদি বলিদান করা হত। তাছাড়া সম্বৎসর বিভিন্ন ধরনের বার-ব্রত পালন করা হত, একাদশী উপবাস পালন করা হত। বিভিন্ন রকম মেয়েলি ব্রতকথার পাশাপাশি পরবর্তীকালে পুরুষও মঙ্গলদেবতার ব্রত পালন করেছে। রাঢ়বাসী ধর্ম পূজক সম্প্রদায়ের লোকেরা শুক্রবার দিনে ধর্ম-একাদশী পালন করত। লাউসেন ছদ্মবেশিনী পার্বতীকে বলেছে—

"লাউসেন বলে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম একাদশী॥
শনিবার দিবসে কদাচ জল খাই।
ধর্মের সেবক হৈলে সুখ নাঞি পাই॥" (ঐ/৯৯)

একাদশী উপবাসে অন্নগ্রহণ, পরগৃহে গমন, শৃঙ্গার নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাই নানা রকম সাত্বিকতার মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে আচার পালিত হত। লাউসেনকে সুরিক্ষা নটী নানা রকম প্রলোভন দেখালে লাউসেন তার সংযমের কথা

জানায়—

"আন জনার ঘরে মোরা জল নাঞি খাই॥" (ঐ/১৭০)

রূপরামের কাব্যে 'জামতি পালা'য় লাউসেন জানায়—

"কি করিব পানগুয়া চন্দন শীতল।
গৃহস্থ লোকের হাথে নাহি খাই জল॥
শিশু কাল হইতে আমি ধর্মের তপসী।
শুক্রবার দিনে করি ধর্ম একাদশী॥
শনিবারে নিয়ম ভাঙ্গিলে জল খাই।
ধর্মের সেবক আমি সুখ নাহি চাই॥
বৌদ্ধবংশ কুলে নাই আমিষ্য ভোজন।
ধর্ম রাখ্যা কখন অধর্মে নাই মন॥" (রূপরাম/১৫৩)

একাদশী উপবাস শেষের পরদিন পারণা বা নিয়মভঙ্গের পরই জলগ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বেশ্যাগৃহে অন্নগ্রহণও সেকালে মহাপাপ বলে সমাজে প্রচলিত ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করে তীর্থবাসে গমন মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে প্রচলিত রীতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী ধর্মকেতু, নিদয়ার কাশীবাস করালেও অনার্য সম্পৃক্ত ধর্মমঙ্গলে প্রসঙ্গটি নেই। সম্ভবত মুকুন্দ চক্রবর্তী উচ্চ বর্ণের সমাজে প্রচলিত বিষয়টি নিম্নবর্ণের অনার্য সমাজে আরোপ করেছেন। তবে সংসার বিরাগী হয়ে, বীতস্পৃহ হয়ে তীর্থবাস বা সন্ন্যাস গ্রহণ সাধারণ বাঙালী সমাজে দেখা যেত। মানিকরামের কাব্যে দেখি শিবঠাকুর পার্বতীর আচরণে বিরক্ত হয়ে কাশীবাসের কথা জানিয়েছে—

"হল নাই ঘরে থাকা মোর হরিদাস।
রাক্ষসীর জ্বালায় করিব কাশীবাস॥" (মানিকরাম/১৩৮)

ইচ্ছাপূরণের জন্য বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাবার আশায়, বিশেষত সন্তান কামনায় যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ তীর্থে তীর্থে ধর্না দেওয়ায় বাঙালীর বিশ্বাস ছিল। সন্তান কামনায় হরিশ্চন্দ্রের তীর্থ পরিভ্রমণ, রঞ্জাবতীর চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা, পশ্চিম উদয়ের মত অবাস্তব বিষয়কে সত্য করার জন্য (অর্থাৎ অসম্ভব সাধন) লাউসেনের কৃচ্ছ সাধন বাঙালীর অন্তঃস্থলের অন্তঃপ্রবাহী বিষয় হয়ে আছে। দৈববাদী বাঙালী সমাজের এই চিরাচরিত বিষয় উপেক্ষণীয় ছিল না। সাধারণত বাঙালী সমাজ ছিল অশিক্ষিত, ফলে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকায় ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের বিশ্বাস ও ভয় ছিল। যেমন রাত্রি বেলা কেউ নাম ধরে ডাকলে ধরে নেওয়া হত নিশি ডাকছে। 'নিশি ডাকা' বলে এক জাতীয় ভীতিকর ধারণা বিশেষতঃ মহিলা মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করত। তাই দেখি লাউসেনের সংবাদ বাহক শুক শারীর ডাক শুনে কানাড়ার মনে হয়—

"দ্বিপ্রহর নিশি ডাকে নাঞি মনকথা॥" (রূপরাম/৩৪৮)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষা। বাঙালীর শিক্ষানুরাগ ও সংস্কৃতি মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় পাই। মঙ্গলকাব্য ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য শাখায় মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত টোল-কেন্দ্রিক, গুরু মহাশয়রা টোলে শিক্ষা দিত, শিক্ষার্থীরা পল্লীগ্রামস্থ টোলে স্থানীয় গুরু মহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভ করত এবং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দূরদূরান্তে গমন করত; নবদ্বীপ, বর্ধমান ছিল অনুরূপ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলার বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য আসত। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য পাঠে জানা যায় সেকালের

শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার স্তর এবং পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে। রূপরামের পিতা পণ্ডিত ছিলেন, সম্ভবত তাঁর নিজের টোল ছিল এবং কবি তাঁর প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন সেখানেই। রূপরাম লিখেছেন—

"পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিশাশয় পড়ুয়া যাহার বিদ্যমানে॥" (ঐ/৭)

পরবর্তীকালে কবি ভ্রাতাগণের চাপে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গমন করেছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। সেকালে প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করত। দরিদ্র সন্ধিৎসু শিক্ষার্থীগণ অপরের সাহায্য নিয়েও শিক্ষালাভ করতে উৎসাহ দেখাত। রূপরাম নিজে অপরের সাহায্য নিয়ে বিদেশ (অন্যগ্রাম) গমন করেছিলেন। কবি লিখেছেন—

"মনে হৈল পড়িতে যাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি॥
পথে যাত্যে সঙ্গে মোর নাই কিছু ধন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ॥
কাখে লয়্যা খুঙ্গি পুথি জুমর অমর।
পাষন্ডা পড়িতে যাই ভট্টাচার্যের ঘর॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হৈল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
যতনে পড়ান পাঠ হরষিত মনে॥" (ঐ/৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, জউগ্রাম উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। গুরু মহাশয় রূপরামকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য যেখানে যেতে বলেছিলেন তা থেকে তৎকালীন উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলির নাম জানা যায়। যেমন—

"নবদ্বীপ যাহ কিবা যাহ শান্তিপুর॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য নবদ্বীপে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কনাদের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞি॥" (ঐ/৮)

টোলগুলি সাধারণত কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ধনী ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপে বা আটচালা গৃহে বসত। সেকালে ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের মত। শিক্ষকদের বলা হত 'গুরু', তাদের উপাধি হত 'ভট্টাচার্য'। রূপরাম সেকালের কয়েক জন খ্যাতনামা ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন, এঁরা হলেন রঘুরাম ভট্টাচার্য, কণাদ ভট্টাচার্য, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

তৎকালে সম্ভবত বাল্যকালেই বিদ্যারম্ভ করা হত, সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ সূচক অনষ্ঠানে হাতেখড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভ করা হত। সাধারণ শিক্ষানুরাগী মানুষ চতুষ্পাঠী বা টোলে শিক্ষালাভ করত, ধনীরা ছেলেমেয়েদের আপন গৃহে গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষা দিত। লাউসেনের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। মানিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স।
বিদ্যারম্ভে উক্ত কৈল্য অপূর্ব দিবস॥

নিবাস নগরে নরোত্তম নামধেয়।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলের পূজনীয়॥
সমাদরে সেন তারে সদনে আনিয়্যা।
সমর্পিলা সুতযুগ্মে সবিনয় কয়্যা॥
নরোত্তম নিত্য ঙিস্রয়ে নিবিষ্টতা বড়ি।
আরম্ভ করাল্য বিদ্যা হাতে দিয়া খড়ি॥" (মানিকরাম/১১৪)

অতঃপর আসা যাক সেকালের পাঠ্যবিষয়সমূহে। সেকালে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে বর্ণপরিচয় দিয়ে পাঠ শুরু করে ধীরে ধীরে বানান শিক্ষা, ব্যাকরণ, গণিত শিক্ষা দেওয়া হত। রূপরাম চক্রবর্তী লাউসেনের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

"ক খ আদি ইঙ্গিতে চৌষট্টি বর্ণ জানে।
পড়িল আঠার ফলা পরিতোষ মনে॥
তবে আঙ্ক আঙ্ক পড়্যা জানিল বানান।
সিদ্ধিরস্তু পড়িতে ঈষত হৈল জ্ঞান॥" (রূপরাম/৯০)

ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট, পাণিনি পাঠ সেকালে জনপ্রিয় ছিল—

"ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত॥" (মানিকরাম/১১৫)

সেকালে ব্যাকরণ পাঠে কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো হত তার বিবরণ দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবি; সাধারণত পদ প্রকরণ, ধাতু প্রকরণ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, কারক বিভক্তি সকলই পড়ানো হত। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে উচ্চশিক্ষার জন্য, শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, তর্ক, মীমাংসা, অলঙ্কার ইত্যাদি পড়ানো হত। রূপরাম চক্রবর্তী নিজের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় পাঠ্যবিষয়গুলির কথা। যেমন—

"মাঘ রঘু নৈষদ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িয়া মনে পাইল বড় প্রীত॥
রামায়ণ ভারথ পড়িল যথাবিধি।
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি॥" (রূপরাম/৮)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে লাউসেনের পাঠচর্চার মধ্যে দিয়ে সেকালের পাঠচর্চার বিবরণ পাই। যথা-

"অষ্টদিন আমূলক পড়্যা অভিধান।
দৃঢ় হৈল্য দোঁহাকার দিব্যান্তরজ্ঞান॥
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র॥
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে।
উত্তম হৈল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে॥" (মানিকরাম/১১৫)

সেকালে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান চর্চার রেওয়াজ বোধহয় ছিল না। মঙ্গলকাব্যে কোথাও ইতিহাস, বিজ্ঞান পাঠের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। তবে এই যুগে জীবন-জীবিকার তাগিদ বড় ছিল না, জ্ঞান আহরণের জন্যই ধ্রুপদী বিদ্যা চর্চা করা হত। মোগল যুগের শেষ প্রান্তে সপ্তদশ–অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে রাজকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য আরবী,

ফারসী ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছিল। স্বয়ং ঘনরাম চক্রবর্তী ফারসী ভাষা শিখেছিলেন বলে জানা যায়। মোট কথা দরবারী জীবনের বাইরে সাধারণ জনসমাজে অন্যান্য বিদ্যাচর্চার রেওয়াজ খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। কাব্যশাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি জ্যোতিষ, তন্ত্রচর্চা, লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির চর্চা হত। ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞরা সাধারণ লোককে শিক্ষা দিত। অশিক্ষিত জনসাধারণ যে তা শিখত তার পরিচয় পাই ঔষধীকরণ, বশীকরণ ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে । তৎকালে ধনী পরিবারের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি দেহচর্চা, মল্লবিদ্যা ইত্যাদিও শেখানো হত। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে প্রসঙ্গটি উল্লেখ না হলেও ধর্মমঙ্গলের আখড়া পালায় লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা করতে দেখা যায়। ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতী সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছে—

"জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই॥" (ঘনরাম/১৪১)

লাউসেন দেহচর্চা, যুদ্ধবিদ্যা সকলক্ষেত্রেই পারদর্শী হয়ে ওঠে, সুতরাং শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাঙালীর দেহচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা চর্চা অবহেলিত ছিল না।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালীর নিজস্ব বিষয়। বাঙালীর সংস্কৃতি বাংলার মাটি ও মানুষের বিষয়, ধর্মমঙ্গল রাঢ়বঙ্গের কাব্য তাই রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচয় এখানে লভ্য। ধর্মঠাকুর যেহেতু রাঢ়বাসীর দেবতা সেকারণে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ধর্মসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মপূজা বিধান সংক্রান্ত যে সকল আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে তা রাঢ়বাসীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিষয়। ধর্মঠাকুর সংক্রান্ত যে সকল রচনা আছে সেগুলি হল— সৃষ্টিপত্তন, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ, ধর্মমঙ্গল এবং ধর্মপূজা বিধান। সংজাত পদ্ধতিতে ধর্মপূজাবিধি জলপাবন, টীকাপাবন, চনাপাবন, দ্বারমোচন, বারমতি ইত্যাদি বিষয়গুলি শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ধর্মপূজা বিধান পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করা হয়, কেননা সেখানে হিন্দুর দেবদেবীর পূজাবিধি প্রবেশ করেছে। রঞ্জাবতীর শালেভর পালায় রঞ্জার চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবন সংক্রান্ত বিধি, লাউসেনের পশ্চিমোদয় সংক্রান্ত পূজা-বিধিতে হিন্দুর প্রচলিত রীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে ধর্মপূজা সংক্রান্ত বিধি, ধর্মের গাজন ইত্যাদিতে ধর্মসংস্কৃতি তথা রাঢ়ের কিছুটা নিজস্ব লৌকিক রূপ প্রকাশিত। ধর্মমঙ্গলে ডোম শ্রেণীর জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবশ্য রাঢ়বাসীর সংস্কৃতির নিজস্বতাকে বহন করে। বাঙালীর বিবাহ সংক্রান্ত আচার-আচরণ, জীবন চর্যার বিভিন্ন উপাদানে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা বহন করে। বাঙালী সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান হল দুর্গাপূজা। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে দুর্গাপূজার অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন, এ চিত্র বাংলাদেশের চিত্র সন্দেহ নেই।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান হিসাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রচুর ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবাদ ঃ ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে এরকম প্রচুর প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। লাউসেন মাতুল মহামদের সঙ্গে বিবাদ জেনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে একটি প্রবাদে বলে—

"গোসিংহে স্বরিসাগুটি রহে কতক্ষণ।
ততক্ষণ ক্রোধ রহে হৈলে শুজন॥"(ময়ূরভট্ট/৯)

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে লাউসেন মাতুলকে প্রথমে তিরস্কার করে কতকগুলি প্রবাদ ব্যবহার করে। যেমন—

"সাস্ত্রের মনস্য কভু বচনের নয়।
হেঙ্গলের পুৎস কভু উজু হবার নয়॥
জাহার চরিত্র সেই না ছাড়ে য়াপনা।
পিতল মাজিলে কভু নাই হএ সোনা॥" (ঐ/১০)

লাউসেনের তিরস্কার শুনে মহমদ ক্রুদ্ধ হয় এবং লাউসেনকে প্রহার করতে উদ্যত হয়, তখন কর্পূর লাউসেনকে

প্রবোধ দান করতে চেষ্টা করে যে মহামদ পাত্রের চরিত্র সংশোধন হবার নয়। কর্পূর যে প্রবাদগুলি ব্যবহার করে সেগুলি হল—

১) "চোরে নাহি সুনে কভু ধর্ম্মের বচন।" (ঐ)

২) "বানরের গলে নাই সোভে হেমমালা।" (ঐ)

নির্বোধ কালু ডোমকে লাউসেন যখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিল কালু তার কিছুই বুঝতে পারেনি। কালুর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না,কালু তাই নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করে—

"বনের বানর ভক্ষএ পত্রফল
সে জানে কেমন ঘি।
বৃক্ষের উপর পাকিল শ্রীফল
কাকের বাপের কি॥" (ঐ/১৭)

লাউসেনের কাছে কালু আপন দারিদ্র্য, জাতি-বৃত্তির কথা নিবেদন করে, কালু আপন অবস্থার জন্য দুঃখিত নয়, কিন্তু লাউসেন কালুকে বুঝিয়ে দেয় দারিদ্র্য সকল গুণরাশি নাশ করে—

নাসএ সতেক গুণ দারিদ্রের দোসে॥
... ...
কুজনের সঙ্গে যদি বৈসে ভাল জনা।
ভাল বুদ্ধি জায় তার হয় কুমন্ত্রনা॥" (ঐ/২৩)

বৃদ্ধের কামোন্মত্ততা বোঝাতে গিয়ে ময়ূরভট্ট কয়েকটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর কামোন্মত্ত হলে নর্তকী উর্বশীকে কামনা করে, তখন উর্বশী বুঝিয়ে দেয় বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা উপযুক্ত নয়—

"অলপ বএ(স) মোর ভেটি নাহি পতি।
লাঙ্গল দড়াতে কভু মুক্তা নাহি গাথি॥" (ঐ/৪৮)

কিংবা, পরনারী আসক্ত হওয়া কাম্য নয়, তার ফল ভাল হয় না—

"পরনারি দেখে কেনে না পায় সোআস্ত।
মুনিলোভে ফণিমুখে দিতে চাহে হস্ত॥" (ঐ)

রঞ্জাবতী-কর্ণসেন লাউসেনের বার বার যুদ্ধযাত্রার কথায় শঙ্কিত হয়, তাই তারা লাউসেনকে নিয়ে গৌড়েশ্বরের রাজ্যের বাইরে বসতি স্থাপন করতে চায়। লাউসেন বুঝিয়ে দেয় ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়, তাই সে বলে—

"ই বোল সুনিঞা সেন কহেন উত্তরে।
মস্তক মুড়াব কত উকুনের ডরে॥" (ঐ/৫৬)

রূপরামের কাব্যে এরকম প্রচুর প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়–

১। মন দড় হয় যদি কৃষ্ণ নাম জপে।
কি করিব গয়া গঙ্গা কি করিব তপে॥

২। পুরুষ থাকিলে মিলে শতেক পরশ।
কেবা নাহি বিভা করে চারি পাঁচ দশ॥

৩। মা বাপের উপায় যেজন বস্যা খায়।
গাধার জাহর বল্যা নাম লেখা যায়॥

৪। রোগ-ঋণ-রিপুশেষ রাখিবারে নাই।

৫। অবশ্য ভাগিনা ধরে মাতুলের ধারা।

৬। সর্বকাল নাই থাকে সমুদ্রের জল।
সর্বকাল নাই থাকে পুরুষের বল॥

৭। কেবা বলে সংসারে সতিনী বড় শুভ।
অঙ্গার ধুইয়া দুগ্ধে কভু নহে ধরো॥

৮। কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।

৯। পুত্র বিনে ধন গারি জীবন অসার ।

১০। ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন হারাইয়া মণি

১১। জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই।

১২। কপালে ঘটিলে কিবা বলা নাঞি যায়।

১৩। অসত্য সমান পাপ নাহিক সংসারে॥

ঘনরামের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ—

১। কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।

২। "নারী হীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগা॥"

৩। ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।

৪। স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।

৫। মিথ্যা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়।

৬। "হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি।

৭। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে।

৮। এক গালে কালি তার আর গালে চুন।

৯। কেবা সে বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে।

১০। কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।

১১। বড় বড় বানরের পুঁড়া পারা পেট।
পবন নন্দন বিনা মাথা করে হেঁট॥

১২। না পারে খণ্ডাতে লোক কপালের লেখা।

১৩। সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোঁতের সেউলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সোঁতের সেউলি॥

১৪। সকলি ভোজের বাজি মিথ্যা অনুরাগ॥
অবিশ্বাসে বিশ্বাস মন্দ ফল ফলে।

১৫। লোকে বলে মাকে চেয়ে মাসী করে প্রীত।

মানিকরামের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ—

১। কন্যা হত্যে জামাতা জীবন হত্যে বাড়া।

২। চাকর কুকুর তুল্য তাকে কেন এত।

৩। কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।

৪। না পারে খণ্ডিতে লোক যা থাকে কপালে।

৫। কুপুত্র হইলে তাকে মা নাহি ফেলে।

৬। তৈল বিহীন চুলেতে কেবল খুড়ি উড়ে।

৭। সধর্মে থাকিলে হয় সর্ব ঠাঞি পার॥

৮। যার ধন তাকে এই শোভা নাহি পায়।

৯। জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।

উল্লিখিত প্রবাদসমূহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষশাসিত সমাজ, বহুবিবাহ, ধর্মকথা, উপদেশ ইত্যাদি সমাজ ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ যার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

প্রতিটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া, ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি প্রচলিত আছে, সেগুলিকে লোকসাহিত্য হিসাবে গণ্য করা যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে লোকমানসের কৌতুক প্রবণতা এবং রসসিক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের বিক্ষিপ্ত নানা উপাদান চয়নে এইসব ধাঁধাঁ তৈরী হয়, জাতির সামাজিক ইতিহাসে সেগুলির মূল্য কম নয়। এগুলি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে গড়ে ওঠায় এর মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে। ঘনরামের কাব্যে গোলাহাট পালায় এজাতীয় ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি আছে। নটী সুরিক্ষা লাউসেনকে বন্দি করার জন্য এজাতীয় কতকগুলি হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করেছিল। তার মধ্যে দু'-একটি উল্লেখ করা হল—

১) "কটিতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুনু বাজে।
কাঙ্কে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা॥
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
জনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল বাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী॥ (জেলেদের জাল)

২) অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ॥
গৃহস্থজনার মৃত্যু গৃহ সঙ্গে হলে॥ (গুটিপোকা) (ঘনরাম/৩০৪-৩০৫)

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও ধাঁধাঁর ব্যবহার দেখা যায়। বিবাহসভায় বরপক্ষ ও কনেপক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ধাঁধাঁর ব্যবহার করা হত। এর মধ্যে দিয়ে ব্যবহারিক বিভিন্ন জিনিসপত্র বা বিভিন্ন বিষয়ে একটা সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানের ব্যবহার আছে। লোকক্রীড়া হিসাবে শিশু ও বয়স্ক সকলের জন্যই বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্র শিশুসাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করত তার কথা পাওয়া যায়-

"সাধে সব শিশু সঙ্গে খেলে বালা নানা রঙ্গে
অঙ্গে শোভা করে রাঙা ধূল।
ফণি মণিহার আর কত রত্ন অলঙ্কার
হাতে হেম গুলতাই বাঁটুল॥" (ঐ/৩১)

গুলতাই-বাঁটুল নিয়ে পাখি শিকার বালকদের একটি সাধারণ খেলা, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার উল্লেখ আছে। তাছাড়া

মাছখেলা বা জলকুমীর খেলা, ঝালি খেলার উল্লেখ আছে রূপরামের কাব্যে—

"গুলতাই বাঁটুল লয়্যা ফিরে ধাওয়াধাই।
বিশেষেতে মহাশক্তি হৈল দুইভাই॥
দুই সন্ধ্যা ঝালি খেলে চড়্যা বড় গাছ।
ছোট দিঘীর জলেতে সদাই খেলে মাছ॥" (রূপরাম/৯০)

পাশাখেলার উল্লেখ আছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। হনুমান যখন পার্বতীর কাছে ধাতু-তত্ত্ব জানতে গিয়েছিল তখন পার্বতী সখীদের নিয়ে পাশা খেলছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা বা মল্লক্রীড়ার কথা আছে। লাউসেন ওস্তাদের কাছে মল্লবিদ্যা চর্চা করেছিল। মল্লক্রীড়া অনেকক্ষেত্রেই মল্লযুদ্ধ হিসাবেও উল্লিখিত। লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা প্রকৃতপক্ষে কুস্তি। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে মল্লবিদ্যা চর্চিত হত; সাধু-সন্ন্যাসীরা কামজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে দেহচর্চা করত। লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চার বিবরণ দিয়েছেন ঘনরাম চক্রবর্তী—

"অত:পর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে॥
উভ কর চরণে মাখিয়া বীরমাটি।
শিখাল সরল শূন্য উলটি পালটি॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধায় ধর্ম্মরাজ।
অমনি মালট মারে নাহি করে ব্যাজ॥
ভূতলে আছড়ে ভুজ মারে মালসাট্।
বীরদাপে ধূলায় ধূসর কৈল বাট॥
বাট বাটী উলটি পালটি মুহুর্ম্মুহু।
করে করে হেলাহেলি ঠেলাঠেলি বহু।
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি।
মহাযুদ্ধ মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি॥
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম বুদ্ধি বাড়ে॥
কাছাড়ে পাছাড়ে পড়ে ছাড়ে সিংহনাদ।
গুরুশিষ্য বিক্রমে বাড়িল বিসম্বাদ॥" (ঘনরাম/১৪৩)

সামাজিক অবস্থা ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাংলার নারী সমাজের স্থান ও অধিকার সম্পর্কে জানা যায়। বাংলার সমাজ পুরুষশাসিত, নারী সেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীলা, অসহায়া ও পরান্নজীবী। বাংলার নারী সমাজের এই অবস্থার পরিচয় পেয়েছি চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার মুখে, সতীনের জ্বালায় অতিষ্ঠ দেবী চণ্ডী সেকালের নারীর প্রতিনিধি। নারীর এই স্বামী নির্ভরশীলতার কারণই হল— অধিকাংশ নারীই ছিল গৃহকোণে আবদ্ধ ও অশিক্ষিত। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সে যুগে গড়ে ওঠেনি; প্রকৃতিগত কারণে নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল হওয়ায় নারী একান্তভাবে পুরুষ নির্ভর ছিল, কিন্তু নারী ভক্তি, প্রেম, স্নেহের জোরে পিতা-পুত্র, স্বামীর পরিবারের কল্যাণময়ী রূপ ধারণ করেছিল। বাঙালী ঘরের নারীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীর সম্পর্ক ছিল। রাঢ়বঙ্গের বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন খুব একটা দেখা যায় না। তবে লক্ষণীয়, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চাইতে

ধর্মমঙ্গল যেহেতু অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি তাই ধর্মমঙ্গলে নারীর অবস্থানগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।দাম্পত্য সম্পর্কে ধর্মমঙ্গল কাব্যে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বিশেষত বাঙালী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের মত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কর্ণসেন, রঞ্জাবতী, লাউসেন,কলিঙ্গা,কানড়া, কালু ডোম, লখ্যা ডোমনীর দাম্পত্য জীবনে অনুরূপ দেখা যায় না। বৃদ্ধ কর্ণসেন স্ত্রী-নির্ভর পুরুষ। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে বালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়; এখানে কৌলীন্য প্রথার দায়ে কুলীন পিতা কুল রক্ষা করেছে এমন নয়, তবু বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বালিকার বিবাহ স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়। বিবাহে পুরুষের কুল-শীল ইত্যাদি প্রাধান্য পেত, তাই কর্ণসেন—

"সকল গুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
কুলে শীলে কেবা আছে সেনের সমান॥
বুড়া বলে কদাচ না ভেব বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন॥
বুড়া নয় খানিক বয়সে বটে বাড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া॥" (ঘনরাম/৭২)

রঞ্জাবতী বালিকা, তার মতামতের প্রশ্ন আসেনি। বিবাহে নারীর মতামতের গুরুত্ব ছিল না। রঞ্জার দিদি ভানুমতী সামান্য আপত্তি প্রকাশ করে–"কি করে কহিব নাথ কর্ণসেন বুড়া।" (ঐ/৭২)। কিন্তু তার আপত্তি স্থায়ী হয়নি। ধর্মমঙ্গলে নারীর মতামতহীন অবস্থার খানিকটা রূপান্তর হয়েছে; তাইতো কানড়া বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে বিবাহ করতে রাজী হয়নি। পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করে একাই গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নারী পতি নির্বাচনে আপন মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়েছে, নিজে পাত্রকে যাচাই করে নিতে চেয়েছে। লাউসেনের সঙ্গে বিবাহে কানড়া ও কলিঙ্গা পেয়েছে যথার্থ স্ত্রীর মর্যাদা, কালুডোমের স্ত্রী লখ্যাও অবহেলিতা নয়, কালুর কাছে সে সম্মান পেয়েছে। তারা শুধুমাত্র স্বামীর অঙ্গ শোভা হয়ে থাকেনি, ধীরে ধীরে স্বামীর সহযোগী হয়ে উঠতে চেয়েছে, সহধর্মিণী হয়েছে। লাউসেনের ব্রত উদ্‌যাপন ও ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করতে গিয়ে ধর্মমঙ্গলে নায়িকাগণ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতনায়ক দ্বারা বিপন্ন হয়নি। কানড়া ও কলিঙ্গা বীরাঙ্গনা, শিক্ষিতা; স্ত্রীধর্ম পালনের পাশাপাশি রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনে পারদর্শিনী।

ধর্মমঙ্গলে বাঙালীর সুছন্দ পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা সকলকে নিয়ে সুন্দর সংসারযাত্রা নির্বাহ হত। তবু কিন্তু বাঙালী পরিবারে শাশুড়ী পুত্রবধূ, ভাজ-ননদ. দুই সতীনের সম্পর্ক খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্কের নানান পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী পতিগৃহে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও তাকে নীরবে সহ্য করতে হত। পিত্রালয়েও তার ঠাঁই হত না। ধর্মমঙ্গলে কিন্তু পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ীর সুন্দর সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুর পর সনকা বেহুলাকে দায়ী করেছে, কিন্তু রঞ্জাবতী তার পুত্রবধূদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেছে। লাউসেনের মৃত্যু সংবাদ পাবার পরে রঞ্জাবতী হাহাকার করেছে কিন্তু পুত্রবধূদের দোষারোপ করেনি। ডোম সমাজেরও একটা পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে। লখ্যা ও তার পুত্রবধূরা একত্রে একান্নবর্তী পরিবার: সেখানে রয়েছে আনুগত্য ও ভালবাসা। লখ্যা শাখা ও শুকা পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে পাঠালে তাদের স্ত্রীরা কিন্তু শাশুড়ীর কথার অবাধ্য হতে পারেনি।

সমাজে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ দোষাবহ ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ কর্ণসেন কন্যার বয়সী রঞ্জাবতীকে বিবাহ করে, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর কানড়াকে বিবাহ করার জন্য লালায়িত হয় এবং কাব্যের নায়ক লাউসেনকে চারবার বিবাহ করতে দেখি— কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা এবং কানড়া তার স্ত্রী।

নিম্নবর্ণের সমাজেও একাধিক পত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাই। কালু ডোমের দুই স্ত্রী— লখ্যা ডোমনী ও সনকা। পুরুষের বহুপত্নী থাকলেও বাঙালী ঘরে যে সপত্নী সমস্যা সৃষ্টি হয় তার তেমন পরিচয় ধর্মমঙ্গলে পাচ্ছি না। আসলে ধনী ঘরের পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলেও তেমন সমস্যা সৃষ্টি করেনি কোনদিন। লাউসেনের স্ত্রীগণ পরস্পর ভগ্নীর মত বসবাস করেছে, কলিঙ্গার মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র চিত্রসেনকে সে কানড়ার হাতে তুলে দিয়েছে। সামাজিক আদর্শবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা ঘটলেও সমাজের মূল প্রবণতা তা নয়; কলিঙ্গা তার মৃত্যুকালে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। কলিঙ্গার মৃত্যুকালে রোরুদ্যমান কানড়াকে কলিঙ্গা বলেছে—

"কেবা বলে সংসারে সতিনী বড় শুভ।
অঙ্গার ধুইয়া দুগ্ধে কভু নহে ধবো।
সতীন বিহনে হবে সোহাগে আগল।
তুমি সতীনের শোকে হয়্যাছ পাগল॥" (রূপরাম/৩৪৬)

এবিষয়ে উঁচুনীচু ভেদাভেদ ছিল না, উচ্চবর্ণের সমাজের মতই নিম্নবর্ণের সমাজেও সতীন চোখের কাঁটা ছিল। কারণ কোন স্ত্রীর পক্ষেই সতীনকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই সমস্যা প্রকট। ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখি বহুপত্নীক পুরুষের কাছে কারও সোহাগের পাল্লা ভারী কারও বা ভাগ্য বিড়ম্বিত। লখ্যা ডোমনী যুদ্ধকালে সতীন সনকার কাছে সাহায্য চাইলে সনকা তার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও লখ্যার সৌভাগ্যের কথা বলে। আবার কানড়া দেবীর কাছে আপন সতীনের প্রাণ ফিরে চাইলে দেবী জানায়—

"শুন বাছা সংসারে সতিনী শেল কাঁটা।
বিধি তোর ঘুচাল বুকের শেল জাঠা॥
যে ঘরে সতিনী বসে সেই দুঃখে ভাজা।
সে তাপে ত্যজিল তনু দশরথ রাজা॥" (ঘনরাম/৬৬০)

মানিকরামের কাব্যেও আমরা সপত্নী সমস্যার কথা দেখতে পাই।

বাঙালী হিন্দু পরিবারে বা সমাজে কৌলীন্য প্রথা একটা বিষময় সমস্যা ছিল। কৌলীন্য প্রথার ফলে বর্ণহিন্দু বাঙালী নারীকুলের দুর্ভাগ্যের শেষ ছিল না। কুলীন কন্যার বিবাহ কুলীন পাত্র ছাড়া না হওয়ায় কুলীন পরিবারের মেয়েদের বিবাহ প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কৌলীন্য প্রথা ক্রমশ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। ফলে সমাজ মানসিকতা দূষিত হয়ে পড়েছিল। কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দিত। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটি এদিক থেকে নানা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কুলীন কন্যার কারো স্বামী হত শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধ, আবার কারো বালক মাত্র, কেউ বা রোগগ্রস্ত, কানা, খোঁড়া ও অন্ধ। রূপরাম কুলীন কন্যার মুখ-নিঃসৃত উক্তিতে এই চিত্রাঙ্কন করেছেন—

"আর যুবতী বলে দিদি বুড়া ভাতার কাল।
পাকা পনস কোলে যেন ঘুমায় শৃগাল॥
না জানি কপাল দোষে মোর স্বামী বুড়া।
ঘটকালি কর‍্যাছিল নির্বংশিয়া খুড়া॥" (রূপরাম/১৫০)

ঘনরামের কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে আরেকজন কুলীন কন্যার মুখে শোনা যায়—

"অধিক অবুঝ পিঠ ভরা কুঁজ
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ জুড়ে ভুমে যায় গড়ে
মিনসে রাজ্যের কু॥

কেহ কহে আলো তোর ভর্ত্তা ভাল
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া কালা কাণা খোঁড়া
খেপা টিপেশোকা তায়॥
বামা বামী রটে স্বামী জুবা বটে
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।
না করে পরশ অলসে অবশ
ভাবে ভামুরের পারা॥" (ঘনরাম/২৫৯)

কুলীন কন্যার এই অবস্থার ফলশ্রুতি আমরা পাই বারুইপাড়ার গৃহবধূ নয়ানীর চরিত্রে। কৌলীন্য প্রথার ফলশ্রুতি নারী সমাজকে অধঃপতিত করেছিল। কুলীন সমাজের নানা কুকর্মের ফল ভোগ করতে হত নারীকে; সপত্নী কলহ, নারীগণের কুলটা হয়ে যাওয়া, বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি কৌলীন্য প্রথার ফলশ্রুতি বলে মনে করা যায়। ধর্মমঙ্গলে জামতি পালায় সুরিক্ষা ও অন্যান্য নারীগণের অধোগতির চিত্র প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র।

মধ্যযুগে নারীর সতীত্ববোধের মূল্য ছিল যথেষ্ট। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ বহুগামী হলেও নারীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা হত, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও তা দেখতে পাই। রূপরামের কাব্যে আখড়া পালায় লাউসেন ছদ্মবেশিনী দেবীকে উপদেশ দিয়েছে, অসতী লোকের সংস্পর্শ পাপ আর পাতিব্রত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—

"লাউসেন বলে শুন বচন সুসার।
দুচারিণী মেয়্যার বচন ষোল ধার॥
অসতী লোকের সঙ্গে করিলে আলাপ।
একাসনে বসিলে বিস্তর বারে পাপ॥
পতিব্রতা সম ধর্ম নাহি ত্রিভুবনে॥" (রূপরাম/১০০)

ছদ্মবেশিনী দেবীকে তাই ফুল্লরা পতিব্রতা হবার উপদেশ দিচ্ছে। ঘনরাম লাউসেনের মুখে অনুরূপ কথাই শুনিয়েছেন—

"স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি॥
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায়॥
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল॥" (ঘনরাম/২৬৪)

অসতী নারীরা সমাজের চেখে ঘৃণিত ছিল, সমাজ তাদের চারিত্রিক স্খলনের জন্য শাস্তি দিত, তারা পতিতা হিসেবে গণ্য হত ; সমাজে, গৃহে কোথাও তাদের ঠাঁই হত না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে গদাধর বারুইয়ের স্ত্রী নয়ানীর পরপুরুষ আসক্তির জন্য নাক, কান কেটে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অসতী স্ত্রীদের অঙ্গচ্ছেদন মধ্যযুগের বিশিষ্ট শাস্তি বিধান রীতি—

"সভা সাক্ষী কর্য়া রাজা কোপে কম্পমান।
বারুই বৌএর লাউসেন কাটে নাককান॥
নাক কান কাটে তার মাথার লোটন।
যেন সূর্পনখার নাককান কাটিল লক্ষ্মণ॥" (রূপরাম/১৫৭)

সমাজের মধ্যে বসবাস করার অধিকার অসতী পতিতাদের ছিল না। সতীত্ব বোধ প্রবল হলেও পুরুষরা নারীর সতীত্বে সদাই সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। ঘরের স্ত্রী পতিতা হলে তাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করা হত। সমাজের অনুশাসনের মধ্যে থেকে পতিব্রতার জয়গান গেয়েছে বেহুলা, ফুল্লরারা আবার চারিত্রিক শিথিলতার জন্য ব্রাত্য হয়েছে হীরা মালিনীরা। তবে মনে হয় সামাজিক কঠোরতা যতই হোক, অন্তরালে চলত ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি, পুরুষের চারিত্রিক শিথিলতা। ধর্মমঙ্গলে গোলাহাট পালায় সুরিক্ষা, তার সহকারী নারীগণ এবং তার ছ'কুড়ি নাগর (পুরুষ পতিতা অথবা বিকৃত কামাসক্ত পুরুষ) এর কথা পাই। রূপরাম লিখেছেন-

"এই গ্রাম গোলাহাট বেউশ্যা রাজার পাট নিবসে সুরীক্ষা বাণেশ্বর।
ভূত ভবিষ্যতি বাণী আমি সব এহা জানি যার সঙ্গে ছকুড়ি নাগর॥" (ঐ/১৫৯)

এই 'বেউশ্যা রাজার পাট' আসলে পতিতা পল্লী। শুধু নারী নয়, পুরুষও বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রূপরামের কাব্যে—

"দামামা নিশান সঙ্গে ব্যালিশ বাজনা।
দেবীপূজা করিছে পুরুষ বারাঙ্গনা॥" (ঐ/২৪)

নারী পতিতারা যেমন কার্তিকপূজা করত, পুরুষ বারাঙ্গনারা দেবীপূজা করত।সুরিক্ষার ছ'কুড়ি নাগর পুরুষ বারাঙ্গনা হতে পারে। মধ্যযুগে নারীর সতীত্ব রক্ষা যেমন কঠিন ছিল তেমনি পুরুষেরও চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখা খুব কঠিন ছিল। জামতি পালায় লাউসেনকে নয়ানী নামক নারীর কু-প্রস্তাব গ্রহণের চিত্রটি বাস্তব চিত্র। বাংলার নারীর এই অবক্ষয়ের চিত্র বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে ধর্মমঙ্গলে ।

মধ্যযুগের সমাজে যে নারীর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল তা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠে বেশ বোঝা যায়। ধর্মমঙ্গলে বোঝা যায় পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকলে কোথাও তেমন কঠোরভাবে পালিত হত না। তবে উচ্চবিত্ত ঘরে বা সাধারণ হিন্দুঘরে সামান্য হলেও পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাই দেবীও লাউসেনকে দেখে জামাই ভেবে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত ধর্মমঙ্গলে দেখি, ঘরের নারীগণ প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, সুতরাং তাদের পর্দানসীন হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। কানড়া, কলিঙ্গা নগর রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করেছে। তারা জানে নারী পর্দানসীন, পরপুরুষ পরশে নারীর জাতি যায়– "যবন পরশে জাতি যুবতীর যায় "(রূপ/৩৪০)। কিন্তু পর্দানসীন থাকা বোধ হয় সম্ভব হয়নি। নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথা ছিল না। তারা পুরুষের সহযোগী হত ও বৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করত। তাছাড়া দাসদাসী, পতিতার পর্দাপ্রথা ছিল না।

নারী সমাজের আরেকটি মর্মান্তিক দিক হল সমহরণ প্রথা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলেও এই প্রথার কথা পাওয়া যায়। রূপরামের কাব্যে পাই কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হবার পর ছয় পুত্রবধূ অনুমৃতা হয়েছে—

"ছয়পুত্র মৈল মোর রণে ধনুর্ধর।
ছয়বধূ অনুমৃতা শূন্য হইল ঘর॥" (রূপরাম/৩০)

আবার লাউসেনের মায়ামুণ্ড পেয়ে তার চার স্ত্রী অনুমৃতা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কাব্যে সর্বত্র দেখা যায় স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হবার কথা। হয়ত একথা ঠিক ধর্মপ্রাণা সাধারণ বাঙালী নারী স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হত, তবে এটা সর্বত্র ঠিক নয়। জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নারকীয় লীলার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বাঙালী ঘরের অধিকাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিত, ফলে চিন্তা চেতনায় তারা ছিল অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া নারী জীবনের নানা রকম বাঁধন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, সুতরাং গৃহকর্ম, সাংসারিক মঙ্গল কামনায় বার-ব্রত নিয়েই তারা থাকত। বাংলার নারীগণ ছিল কর্ম-কুশল; তারা গৃহিণী, অনেকক্ষেত্রেই স্বামীর সহযোগিনী হত। ধনী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরাও অনেক সময় অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। নিম্নবর্ণের

সমাজে নারীরা খেয়া পারাপার করত, পশুপালন করত, ঝুড়ি-চাটাই বুনত. বাঁশ ও বেতের কাজ করত, পসরা সাজিয়ে বেচাকেনা করত। ধর্মমঙ্গলের ডোম নারীরা শুধু পুরুষের সহকর্মী তাই নয় ,তারা ছিল বীরাঙ্গনা। লখাই ডোমনী যথার্থ ভাবে বীরাঙ্গনা, তার পুত্রবধূরাও বীরাঙ্গনার মত আচরণ করেছে। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী নারীর যে অবস্থান লক্ষ করা যায় তা ধর্মমঙ্গলে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। রঞ্জাবতী সনকার মতই স্নেহশীলা বাঙালী মা. কিন্তু কানড়া, কলিঙ্গা, লখাই, ধূমসীরা বীরাঙ্গনা। নারীর ব্যক্তিচেতনা ও চাওয়া-পাওয়ার মানসিকতায় যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা যায় কানড়া চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। সুতরাং নারীর অধিকার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে এটা বোঝা যায়। ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা পিতার কথামত লাউসেনকে বিবাহ করেছে কিন্তু কানড়া পিতার অবাধ্য হয়েছে। গৌড়েশ্বরের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে আপন প্রেমকে জয়ী করেছে, নিজস্ব কামনার মূল্য দিয়েছে। কলিঙ্গা ও কানড়া এক হিসাবে মাইকেলের প্রমীলার পূর্বসূরী। ধর্মমঙ্গলের নারী শুধুমাত্র বার-ব্রত নিয়ে অন্তঃপুরে বন্দি থাকতে চায়নি, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে তারা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারী অনেক বেশী বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ধর্মমঙ্গলের নারীরা কেউ কেউ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন— রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানড়া প্রত্যেকেই শিক্ষিতা নারী। এ সময়ের বারবিলাসিনীরা শুধু পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, রূপচর্চা, দেহচর্চা, কামকলাতেও শিক্ষিতা। এযুগের নারীরা শুধুমাত্র রূপবান পুরুষ দর্শনে মনকলা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা কামনা-বাসনাকে মূল্য দিয়েছে। বারুই-বৌ নয়ানী ইপ্সিতকে পাবার জন্য কূলে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, কিন্তু সামাজিক অবস্থান মানুষের তথাকথিত মূল্যবোধ তার কামনা-বাসনার মূল্য দিতে পারেনি। সমাজ-আদর্শগত দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাস্থ্যকর না হলেও কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান।

জাতি-বৃত্তি ঃ মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গ নানা ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম বলতে মূলত হিন্দুধর্ম এবং তা লৌকিক বা অনার্য হিন্দুধর্ম। মুসলমান বা ইসলামের ভক্তরা থাকলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুসলমানদের কোথাও সামান্য নামোল্লেখ ব্যতীত তার জাতি, বৃত্তি, জীবন চর্যার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। রাঢ়বঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই অনার্য অধ্যুষিত এলাকা। এই বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা প্রধানত ডোম শ্রেণীর মানুষ। তবে ডোমগণের মধ্যেও বাস্তবে জাতিজনিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের উপাসক হলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা ধর্মঠাকুর পূজিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন ব্রাহ্মণ কবিগণ। মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গে ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দুসমাজ প্রাধান্য লাভ করলে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা রাঢ়বঙ্গীয় সমাজে প্রবেশ করেছে। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে এই চার বর্ণের কথাই পাওয়া যাচ্ছে।ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক আচার-আচরণে খুব একটা পার্থক্য ছিল না; কিন্তু শূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলত না। উচ্চবর্ণের কাছে তারা ছিল সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু নিজেকে অনার্য, অন্ত্যজ. রাঢ় রূপে চিহ্নিত করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখতে পাই রাঢ়বাসীকে এভাবে হিংস্র, বর্বর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাজ বিবর্তনের পথেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন প্রধান বর্ণের ভেদাভেদ অনেকটা লোপ পায়, আবার অব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে ধীরে ধীরে একে অপরের সাথে মিলিত হতে থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণেতর যে ছত্রিশটি জাতির কথা আছে তার অধিকাংশই ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। সামাজিক অবস্থান ও বৃত্তি অনুসারে মানুষের শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনে গুজরাট নগরে মানুষের যে জাতি ও বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তার প্রায় সবগুলিই ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত। তবে মধ্যযুগীয় সমাজ বিন্যাস অনুসারে যে বিবরণ মুকুন্দ চক্রবর্তী দিয়েছেন তা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছুটা নষ্ট

হয়েছিল। জনজীবন কিছুটা মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল, জন্মগত কৌলীন্যের চাইতে অর্থ বা ক্ষমতাগত কৌলীন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষত বণিক সম্প্রদায় অর্থ প্রতিপত্তির জোরে যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করত, তার পরিচয় ধর্মমঙ্গলেও আছে। ক্ষত্রিয় সমাজও যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণকে নীচে রেখে সমাজের উপরের স্তরে উঠে এসেছে ধর্মমঙ্গল পাঠে তা জানা যায়। ধর্মমঙ্গলের কবি যে বৃত্তিজীবীতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রে কোন ভেদাভেদ নেই। ঘনরাম তাঁর কাব্যে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় বা ঢেকুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় নানা জাতি, বৃত্তির মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর কথা মনে হলেও এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই নগরে বসবাস করতে শুরু করেছে। শুধু মাত্র বেশ্যা, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও মুসলমান ব্যতীত সকলেই নগরের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করছে। ঘনরামের বর্ণনা অনুসারে—

"করিয়া আসন গাড়িল নিশান
সম্মানে বসান পদ্য।
স্বধর্মমণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥
.....
করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র
মাজ্জিত মৌলিক যত॥
সিংহ দাস দত্ত আদি যে মহত্ব
বসিল উত্তর রাঢ়ী।
গোপ অবতংশ কত রাজবংশ
কুমার করিল বাড়ী॥
তিন কুল রাজ পুরে সুসমাজ
মহত্ত্ব মর্য্যাদাবান।
গণ্য গোপ যত করিল বসত
পাল ঘোষ কলে পান॥
হয়ে হরষিত বসিল নাপিত
তাপিত আছিল যত।
পসারি তামুলী তাঁতি তেলি মালী
কুতুহলে বসে কত॥
ধার্ম্মিক ধনিক পঞ্চ যে বণিক
যতেক কর্ম্মী কুমার।
উগ্রধর্ম্মধারী বসিল আগুরি
শাঁখারী করমকার॥
মদক বারুই আদরে এ দুই
বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার নাহি ব্যবহার

হেন হীন জাতি কত॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পল্লবাদি গোপ

সুবর্ণবণিক কলু।

কেওট কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার ধূর্ত্ত

ছুতার বাইতি জালু॥

তাতালে মদক বসিল রজক

গুড়ি নুড়ি চুড়িকার।

পুরীর প্রান্তরে বেশ্যা থরে থরে

অন্ত্যজ জাতি অপার॥

ডোম হাড়ি শুঁড়ি বৈসে গড় বেড়ি

বিশাল কোটাল কোল।

কিরাত প্রবল রণশিঙ্গা মাদল

নিনাদে নাগরা ঢোল॥

পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর

বসিল যবন যত।

পাইয়া মর্য্যাদা কত মীরজাদা

সৈয়দ পাঠান কত॥" (ঘনরাম/৫৭-৫৯)

এখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানগণ পৃথকভাবে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে নানা বিভাগ থাকলেও সকলেই মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে। ঘনরাম লিখেছেন—

"সমর কুশল বসিল মোগল

শেখজাদা যত জনা।

পেলে এক রুটী সবে খায় বাঁটি

রণে পাশরে আপনা॥" (ঐ/৫৯)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ বর্ণিত ছত্রিশ প্রকার শূদ্র জাতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। এরা হল —করণ, অম্বষ্ট, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, কুম্ভকার, তৌলিক, শাণ্ডিক. কংসকার, দাস, বারুজীবী মোদক, মালাকার, সুত, রাজপুত, তাম্বুলী, তক্ষক, রজক, স্বর্ণকার, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবক, শেখর, জালিক, মালগ্রাহী, কুড়র, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মল্ল ইত্যাদি। এদের মধ্যে অবশ্য উত্তম সঙ্কর, অধম সঙ্কর, অন্ত্যজ ইত্যাদি নানা শ্রেণী ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এ সব বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় আছে, তবে তাদের ভেদাভেদ খুব একটা যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত অর্থ ও ক্ষমতার দ্বারা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই দেখা যায় ইছাই ঘোষ গোয়ালা হলেও এবং কর্ণসেন, লাউসেন বর্ণশ্রেষ্ঠ না হলেও সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে তাদের অবস্থান। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা বিদ্যার্চ্চা করত এবং অন্যান্যরা স্ব-স্ব বৃত্তিতে অবস্থান করত। যেমন মহামদ লাউসেনের ময়নানগর আক্রমণ করলে সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের বৃত্তি ত্যাগ করে পলায়ন করে। কবির বর্ণনায়—

"তামলি পালায় গুয়া করে হুড়মুড়।

মোদক পালায়্যা যায় পেলি তার গুড়॥

কাএস্ত পালায় পেলি কাগজের গড়া।

ব্রাহ্মণ সকল হৈল চারিবেদ ছাড়া॥
বারুই পলায়্যা যায় তেলি আর তাঁতি।
এতদিনে নষ্ট হৈল ময়না বসতি॥" (রূপরাম/৩১০)

কিংবা মানিকরামের কাব্যের দ্বাদশ (অঘোরবাদল) পালায় বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়-

"ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা।
তামুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা॥
কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি।
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি॥
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট।
তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট॥" (মানিকরাম/৪৭৭)

তাছাড়া বাইতি, ধীবর, হাড়ি, শুঁড়ি, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজদের কথা তুলে ধরেছেন ধর্মমঙ্গলের কবিরা। বাইতিরা ছিল বাদ্যকর, বাজনা বাজিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মমঙ্গলে হরিহর বাইতির কথা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে বেশ্যা শ্রেণীর কথা আছে, এরা দেহোপজীবী। ধর্মমঙ্গলে সুবিক্ষা পালা বা গোলাহাট পালায় এই শ্রেণীর পরিচয় পাই। জামতি পালায় বারুইপাড়া ও গোলাহাট নগরী প্রকৃতপক্ষে নগরের মূল অংশের বাইরে অবস্থিত পতিতাপল্লী ভিন্ন কিছু নয়। এরা যে মধ্যযুগীয় সমাজে খুব একটা নিন্দনীয় ছিল তা নয়। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এরা নিন্দনীয় হলেও বেশীর ভাগ মানুষের কাছে এরা গ্রহণীয় ও আদরণীয় ছিল। অবশ্য একশ্রেণীর মানুষের কাছে তারা গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ বেশ্যার ঘরে অন্নগ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। দেব সেবায় তাদের অধিকার থাকত না, তাই লাউসেন সুরিক্ষার অন্নগ্রহণ করলে ধর্মপূজা প্রচার হবে না বলে ধর্মদেব শঙ্কিত হয়েছে। সমাজের পক্ষে এটি খুব একটা সুস্থ চিন্তার বিষয় না হলেও বেশ্যারা একটি বৃত্তিধারী শ্রেণী। মুকুন্দের কালকেতুর গুজরাট নগরেও বারবধূজনের বসতির কথা আছে। বাস্তবিক পক্ষে নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত হলেও কিন্তু এরা ছিল-হিন্দু সমাজের অংশ। মনসামঙ্গলে মুসলমানরা যেখানে গ্রামে বসবাস করত, ধর্মকর্ম, বিচারকার্য সম্পাদন করত, কৃষি বা মজুরীবৃত্তি গ্রহণ করত, ধর্মমঙ্গলে সেখানে তারা সামরিক বৃত্তিগ্রহণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই হয়ত তাদের সামরিক বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সমাজ মূলত চৈতন্য প্রভাবিত অনেকটা মুক্ত সমাজ। জাতিগত বৃত্তিগত ভেদাভেদ থাকলেও ব্যাপকভাবে প্রকট ছিল বলে বোধ হয় না। আসলে জাতিগত, ধর্মগত ভেদাভেদ হ্রাস পেয়েছিল। তাইতো লাউসেন অনায়াসে কালুডোম ও তার বংশধরদের আপন করে নিয়েছিল। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ মানবতাবাদী ছিলেন, তাঁরা লাউসেনকে দিয়ে ডোমদের অন্ত্যজ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, আসলে অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষকে কৌলীন্য দেয়। কালুডোমের সামরিক বৃত্তি গ্রহণে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে; সমাজে তারা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। কালু ডোমেরা জানে তারা জাতি-বৃত্তিতে রাঢ় (হিংস্র), তবু আপন বৃত্তিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। এখানে লখাই ডোমনীর সগর্ব উক্তি স্মরণযোগ্য—

"জাতিবৃত্তি ভূষণ নগরে বেচি চেটা।
মার্জারের গলে নাকি শোভা করে ঘাঁটা॥" (রূপরাম/৩২২)

কিংবা— "লখে বলে জাতি রত্তি ভূষণ আমার।" (ঘনরাম/৬০৬)

জাতিগত ভেদাভেদ কত ঠুনকো ছিল সেকালে তার প্রমাণও আছে ধর্মমঙ্গলে। যুদ্ধে ও প্রতিহিংসায় জাতিগত ভেদাভেদ লোপ পেয়েছিল। মহামদ ময়নানগর জয় করে লাউসেনের স্ত্রী কানড়াকে হাসন-হুসন (মুসলমান) কে দিতে চেয়েছে—

"কলিঙ্গা কানড়া দিব হাসন হুসনে।" (রূপরাম/৩১০)

শুধু তাই নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহামদ কালু ডোমকে কুল পুরোহিতের মর্যাদা দেবার কথাও ভেবেছে—

"নতুবা কালুর সঙ্গে করিব পিরিত।
ইনাম করিব তারে কুল পুরোহিত॥" (ঐ/৩১০)

ধর্মপূজক সম্প্রদায়ের কাছে ডোম শ্রেণীর পুরোহিতই গ্রহণীয় ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধর্মঠাকুর পূজা করলেও ডোম পুরোহিতই সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। হয়ত ধীরে ধীরে উচ্চশ্রেণীর সমাজেও ধর্মঠাকুরের পূজায় ডোম পুরোহিত গৃহীত হয়েছিল, এখানে সূক্ষ্ম সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলে রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ মঙ্গলকাব্য থেকে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় উদ্ধার করা কিংবা তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমি খুঁজে বের করা সহজ নয়, কারণ তথ্যগত অপ্রতুলতা। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ রাজনীতি সচেতন ছিলেন না, তাঁরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক তথ্য পরিবেশন করেননি। ধর্মমঙ্গল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনঘটাময় কাব্যধারা। ধর্মমঙ্গলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্মপূজা প্রচার হলেও কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী গ্রহণ করেছেন কবিরা। এরকম যুদ্ধবিগ্রহময় কাহিনী রাঢ়বঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার কারণও ঐতিহাসিক। বস্তুতপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সহিত উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধ থেকে বর্গী হাঙ্গামা পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গ বারবার যুদ্ধবিগ্রহের শিকার হয়েছে। রাঢ়বাসী বারবার নিগৃহীত হয়েছে, ফলে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। একারণে ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ধর্মমঙ্গল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালের গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র গৌড়েশ্বর, ইছাই ঘোষ, কর্ণসেন, সোম ঘোষ, লাউসেনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তারা যে ঐতিহাসিক চরিত্র হতে পারে সে নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তাতে গৌড়েশ্বরকে কখনো দেবপাল, কখনো বা লক্ষ্মণ সেন বলে অনুমান করা হয়েছে। এরকম প্রসঙ্গ রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে—

"মহিমন রাজন সুধর্মপাল রায়।
গোউড়ে রাজতি করে কৃষ্ণের কৃপায়॥
... ...
পুরীর সহিত রাজা গেল স্বর্গবাস।
তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস॥" (ঐ/১৮)

ঘনরামের কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥" (ঘনরাম/৫২)

ঢেকুরীর ঈশ্বর ঘোষের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকেই তাকে ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের তাম্রশাসন বলে মনে করেন। ঈশ্বর ঘোষই সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। লামা তারানাথ লবসেন নামে একজন গৌড়ের রাজার কথা বলেছেন, কেউ কেউ বলেন ইনিই লাউসেন[৩]। অনেকে আবার মনে করেন ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর হলেন দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল। ধর্মমঙ্গল কাব্যদেহে রূপায়ণে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাই। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্রাট বা রাজা বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ করের বিনিময়ে সামন্ত শাসককে

শাসন ক্ষমতা অর্পণ করত। ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষ ও কর্ণসেন আসলে গৌড়েশ্বরের সামন্ত শাসক। কর দিতে অপারগ হলে সামন্ত শাসকের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হত, তাদের বন্দি করা হত। ধর্মমঙ্গলে আমরা দেখি সোম ঘোষকে কর না দেবার কারণে বন্দি করা হয়েছে—

"সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গত বর্ষে মহারাজে গোচর করিতে॥
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফঃস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দীখানা॥" (ঐ/৫৩)

রূপরামের কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ দেখতে পাই। গৌড়েশ্বরের পাত্র মহামদ কর দিতে না পারা এবং প্রতারণা করার অভিযোগে সোম ঘোষকে বন্দি করেছে—

"পাত্র বলে শুন রায় আমার বচন।
বৎসরের কর দেই পঞ্চাশ কাহন॥
পঞ্চাশ কাহন দেই সাত কাহন কানা।
তার পাকে রাখ্যাছি গোউর বন্দিখানা॥" (রূপরাম/১৯)

গৌড়েশ্বর সোম ঘোষকে মুক্তি দিয়ে ত্রিষষ্ঠীগড়ের সামন্ত হিসাবে নিযুক্ত করে—

"সোমঘোষে ভূপতি আপনি ডেকে কন।
এখানে তোমার আর নাহি প্রয়োজন॥
বারভুঁঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্টির গড়ে॥
সে মোর পরম বন্ধু বান্ধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরশাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াব ঠাকুরাল।
ঘোষের দোশালা দিল সরবন্ধ জোড়া।
বকশিশ করেন পুন চড়নের ঘোড়া॥
নাগরা নিশানা দিল লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥" (ঘনরাম/৫৪)

আবার বিপত্নীক বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়ে তাকে ময়নাগড়ের সামন্ত নিযুক্ত করে—

"আপনার ছোট শালী তোরে বিভা দিল।
বিধাতা মনের সাধ সফল করিল॥
... ...
ময়না নগরে গিয়া তোল ঘর বাড়ী।
বৎসরান্তে পাঠাইবে রাজকর কড়ি॥" (রূপরাম/৩৫)

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রনীতির একটা অন্যতম বিষয় বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা পরাজিত নৃপতিকে সামন্তরাজে পরিণত করা। গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী মহামদ কৌশলে লাউসেনকে দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়েছে এবং বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করিয়ে সামন্তরাজে পরিণত করেছে। লাউসেন কামরূপ জয় করে কর্পূরধলের

কন্যা কলিঙ্গাকে ও শিমূল রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহ করে রাজ্যবিস্তার নীতির দ্বারা। ঘনরামের কাব্যে পাই—

"অবনীমণ্ডলে এবে রাজা গৌড়পতি॥
প্রতাপে যতেক দেশ জয় করি ভূপ।
আজ্ঞা দিল আমারে জিনিতে কামরূপ॥
কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর॥" (ঘনরাম/৩৯১)

পরাজিত কাঙুররাজ লাউসেনের কাছে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে স্বীকৃত হয়—

"শুন রাজা লাউসেন মোর নিবেদন।
অবিলম্বে দূর কর কঠিন বন্ধন॥
দারুণ বন্ধনে প্রাণ হয়্যাছে কাতর।
বার বৎসরের দিব কাঙুরের কর॥
কর দিব বেবাক কলিঙ্গা দিব দান।
দশ গুণে রূপবতী শচীর সমান॥" (রূপরাম/২২৪)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল সম্রাট আকবর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা পররাজ্য গ্রাস করে সামন্তরাজে পরিণত করেছেন এবং নিজ সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সামন্তরা স্বাধীন হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। ঢেকুরের সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কর দিতে অস্বীকার করে। ইছাই ঘোষকে দমন করতে গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে পাঠিয়ে ছিল। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। তাছাড়া ইছাই পরাক্রান্ত হয়ে গৌড়েশ্বরের রাজ্যে অত্যাচার শুরু করেছিল, এবং সে গৌড় শহরে রাজকর দিতে নিষেধ করে দিয়েছিল—

"গুলতাই বাঁটুল বাঁশ করে বীরপনা।
রাজকর গোউর শহরে হইল মানা॥
... ...
হেনকালে ভাটরায় রাজকর লয়্যা।
গোউর শহরে যায় দোলায় চাপিয়া॥
গোউর শহরে যায় লয়্যা ইরসাল।
রাজকর লুট্যা নিল ব্যালিশ চন্ডাল॥
... ...
ভাটের বিষম দশা ঢেকুরের গড়ে।
রাজকর যাত্যে মানা গোউর শহরে॥
... ...
ইছাই বলিল মোর ঐরি কোন ধাতা।
খেদাড়িয়া কর্ণসেনে লব দন্ড ছাতা।
পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।
গউড়ের কর লবে কাহার যোগ্যতা॥" (ঐ/২৩-২৪)

শুধু তাই নয়, গৌড়েশ্বর কর সংগ্রহের জন্য গৌড়ে এলে সোম ঘোষ আপন প্রতাপবশত কর প্রদানের জন্য

উপস্থিত হয়নি—

"জিজ্ঞাসায় জানিল মাহুদ্যা মহীক্ষিপ।
আসে নাই সোমঘোষ ঢেকুরের নৃপ॥" (মানিকরাম/৩৬)

ইছাই ঘোষ আপন ক্ষমতা বলে ত্রিষষ্ঠীগড়ের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'ঢেকুরগড়'। কবি এসম্পর্কে লিখেছেন- "ত্রিষষ্টি ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর।" (ঘনরাম/৬১)। সুতরাং গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে।

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার মোটামুটি একটি পরিচয় পাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে। অনেক সময় রাজা বা সম্রাটগণ শাসনকার্যে অবহেলা করে বিলাস-ব্যসনে সময় কাটাত, তারা চলত মন্ত্রী ও পারিষদদের পরামর্শে। এই রকম গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী ছিল মহামদ বা মাহুদ্যা পাতর। অধিকাংশ সময় রাজা বা সম্রাট কোন বিবেচনা ছাড়া মন্ত্রী ও অমাত্যগণের কথামত শাসনকার্য পরিচালনা করত, ফলে জনসাধারণ রাজার অগোচরে নিপীড়িত হত। ধর্মমঙ্গলে আমরা গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহামদকে শাসন করতে দেখি, ফলে লাউসেন বারবার মহামদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে, নির্বাতিত হয়েছে ডোম সম্প্রদায়ের মত সাধারণ মানুষগুলি। মহামদ লাউসেনকে মিথ্যা কথা বলে তাকে বিপদে ফেলবার জন্য, তার সর্বনাশ করার জন্য নানা ফন্দি এঁটেছে। সে লাউসেনের পিতামাতাকে বন্দি করেছে । বিবাহ করতে গিয়ে মহামদের প্ররোচনায় স্বয়ং গৌড়েশ্বর হেনস্তা হয়েছে।স্বয়ং ধর্মঠাকুর এই মধ্যযুগীয় অপদার্থ সামন্ততান্ত্রিক শাসকের প্রতিভূ।মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মঠাকুর স্বয়ং প্রতিষ্ঠা আদায়ে সচেষ্ট হয়নি বটে. কিন্তু অনুচরদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করেছে।মনসা, চণ্ডী পূজা প্রচারে অবতীর্ন হয়ে নিজে স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুর নিস্পৃহ থেকে ভীম, হনুমান ও অন্যান্যদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করেছে। মাঝে মাঝে স্বয়ং গৌড়েশ্বর ও ধর্মঠাকুরকে একই ব্যক্তি বলেই মনে হয়, কারণ গৌড়েশ্বর অন্যায় জেনেও অবিবেচকের মত মহামন্ত্রীর পরামর্শ মত কার্য করেছে, আর ধর্মদেবও ভক্তের নিপীড়নের কথা জেনেও তার প্রতিকারের কথা ভাবেনি। ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের অবিবেচক, নিস্পৃহ, শাসনক্ষমতাহীন রূপ প্রকাশিত হলেও সে অত্যাচারী ছিল না, তার রাজত্বে প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকত। সে পুত্রের মত প্রজা পালন করত—

"ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্রপ্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥" (ঘনরাম/৩৭০)

ধর্মপাল গৌড়েশ্বর ঐতিহাসিক ধর্মপাল কিনা তা বড় কথা নয়, মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সে সুশাসন কায়েম করেছিল তা জানা যায়।

ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কাব্য রচনা করেছিলেন, সম্ভবত ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। এসময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়নি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, অনেক পরবর্তীকালের কাব্য বলেই হয়ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনা নয় কিন্তু নিজ জাতি প্রীতি, সেই সঙ্গে প্রজার কল্যাণ চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মত ধর্মমঙ্গলের কবিগণ শুধুমাত্র পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক আদর্শের কথাই বলেননি, বিশেষত ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে চিন্তার ঔদার্য প্রকাশিত। বাস্তব চেতনার মহৎ মানবাদর্শে ধর্মমঙ্গল কাব্যখানি অভিষিক্ত হয়েছে। তাইতো পৌরাণিক দেবীও যুদ্ধযাত্রা করে ভেবেছে কোন উপলক্ষ ছাড়া মানবের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করা যায় না। দেবীর কালগত বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতিগত ক্ষেত্রে যেখানে আদর্শহীনতা ও মানবতাবোধের বড় অভাব সেখানে ঘনরাম মানবতাবোধ ও আদর্শবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ঘনরামের কালগত বাস্তবতাবোধের পরিচয় বলেই মনে করা যায়। কবি কেবলমাত্র পৃষ্ঠপোষক রাজার মঙ্গল কামনা করেননি সেই সঙ্গে তিনি রাজা-

প্রজা সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন—

"চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।" (ঐ/৩৫০)

কিংবা— "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥" (ঐ/৬৮৬)

ঘনরামের পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যে এই উদারতা দেখা যায়নি। অবশ্য শুধু ঘনরামের কাব্যেই নয় সকল ধর্মমঙ্গল কাব্যেই জাতি-বৃত্তিগত চেতনা, রাজা ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের সামান্য প্রকাশ দেখতে পাই। লাউসেন যখন কালু ডোমকে সঙ্গে করে ময়নানগর নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাদের সম্মান দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চেয়েছে, তখন কালু ডোম লাউসেনের সঙ্গে যেতে চাইলেও দেশের জন্য, সাতপুরুষের ভিটেমাটির জন্য বেদনা বোধ করেছে। রাজা তাদের যদিও কোন খোঁজ করে না, তবু তারা রাজনিন্দা করে পালিয়ে যেতে চায়নি। রূপরামের কাব্যে আছে—

"রমতি গোউড়ে সাত পুরুষের মাটি।
পূর্বাপর রাজার চাকর গুয়াহাটি॥
অনেক দিবস আছি ডোম তের ঘর।
ইবে তত্ত্ব নাই লয় রাজা গৌড়েশ্বর॥
চাকর রাখিতে যদি নিজ সঙ্গে নিবে।
একবার এই তত্ত্ব রাজাকে কহিবে॥
রাজানিন্দা করি কেন যাব পালাইয়া।
সংহতি আপনি লহ রাজাকে বলিয়া॥
রাজাকে বলিলে পরিণাম ভাল হয়।
লবণে জিনিলে তবে ঘরে অন্ন রয়॥" (রূপরাম/২০৫)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যেও সামান্য স্বদেশ চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। তাই কবি লিখেছেন—"রাজার কল্যাণ হলে রাজ্যের মঙ্গল।" আমরা জানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু মানিকরামের কাব্যে কালু ডোম স্বদেশ পরিত্যাগ করতে রীতিমত বেদনা অনুভব করেছে। তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে "জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী।" এই ধারণা—

"সে যদ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পারি॥
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল।
কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল॥" (মানিকরাম/৩১১)

শুধু তাই নয়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতুর মত কালু ডোমেরা রাঢ়বাসী হওয়ার জন্য বেদনাগ্রস্ত নয় এবং সমাজে ঘৃণিত বলে তারা মনে করেনি। বরঞ্চ নিজের জাতি-বৃত্তির গর্বে তারা গর্বিত, নিজ পরিচয় দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে কালুডোম লাউসেনকে জানিয়েছে, তার পক্ষে জাতি-বৃত্তি পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কবি লিখেছেন—

"ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল।
তাড়িয়ে চলিল কালু শূকরের পাল॥
সেন কন ময়না ধর্মের স্থান হয়।
তায় অনাচার করা উপযুক্ত নয়॥
রেখে চল নদীকূলে বিপিনে নতুবা।

কালু কয় না হল্য আমার তবে যাবা॥
না করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভার।
ইহাতে যে মত হয় হুকুম তোমার॥" (মানিকরাম/৩১৩)

কবি ডোমশিশু আর শূকর ছানাকে সমান করে দিলেও কালু ডোমেরা "জেতের ব্যাভার" ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। আত্মসচেতনতা, স্বদেশ প্রীতি এবং জাতি প্রীতি না থাকলে এই সগর্ব উক্তি সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা যায়; যদিও এই সমস্ত ঘটনায় তৎকালীন রাষ্ট্রনীতির প্রভাব আছে।শাসক চেয়েছিল প্রজাকে ভূমিতে ধরে রাখতে, তাই বাসস্থান ত্যাগ করতে হলে শাসকের অনুমতি প্রয়োজন হত।

ধর্মমঙ্গলে ডোম সমাজের বীরত্বের কথা আছে, কালুডোম, লখাই ডোমনী, শাকা-শুকা প্রতিটি চরিত্র বীরত্বে উজ্বল। একারণেই ডোম সমাজের এই বীরত্ব ও নিষ্ঠা সুন্দরভাবে কাব্যে রূপলাভ করেছে। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য ফলশ্রুতি লক্ষ করা যায়। দেশে সুখ সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু গৌড়ের দুরবস্থা দেখে গৌড়েশ্বর বিস্ময় প্রকাশ করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাই, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত নয়; প্রজার দুর্গতির কারণ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহার। সামন্তশাসকগণ অধিক লোভে দিল্লীর মোগল শাসকদের মত বিশাল আড়ম্বরময় বিলাস-ব্যসনে প্রচুর ব্যয় করার ফলে প্রজাদের কর ভারে জর্জরিত করেছে। স্থানীয় কর্মচারীগণও শাসকের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত কারণে অতিরিক্ত কর আদায় করেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত, তার প্রারম্ভিক পরিচয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর পাত্র মহামদের কাছে জানতে চেয়েছে—

"দেশে নাই অনাবৃষ্টি প্রতি বিঘা আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা॥" (ঘনরাম/৩৫১)

শাসকের অগোচরেই রাজকর্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করত একথা ঐতিহাসিক সত্য।

বস্তুত পক্ষে মহামদ ক্ষমতা পেয়ে যে অত্যাচার শুরু করেছিল তার বর্ণনা ময়ূরভট্ট, ঘনরাম ও মানিকরামের কাব্যে পাওয়া যায়। ময়ূভট্টের কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী বর্ণিত শাসকের অত্যাচারের বিবরণ আছে। প্রজাদের নিকট থেকে চাষের বিনিময়ে অধিক কর আদায় হত, ষোল কাঠায় কুড়ার জায়গায় এগার কাঠায় কুড়া পরিমাপ করা হত, ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তিতেও কর আদায় করা হত— এসমস্ত বিবরণ ময়ূরভট্টের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে। ঘনরাম চক্রবর্তী কাব্যে শাসকের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

"অবিচারে ভাঙে রাজ্য গৌড়ের ভুবন ।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয় ।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয় ॥
কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।
অসতে আদর নিত্য সৎপথে কন্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত ।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত॥
রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।

অতেব সকল প্রজা হোলো দেশছাড়া ॥
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা॥
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ॥"(ঐ/৩৫১)

মানিকরামের কাব্যেও এই বর্ণনা পাই—

"দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্খ দেও নিত্য॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সদ্য গুণাকার করে॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব।" (মানিকরাম/৩৩)

শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল। এ হল তৎকালীন বাস্তব রাষ্ট্রচিত্র। প্রজারা তিন সনের কর দিয়েও বন্ধন দশা মুক্ত হচ্ছে না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেদের দিয়ে বেগার খাটানো হচ্ছে এরূপ রাষ্ট্রচিত্র পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলে। যেমন—

"রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর।
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার॥
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা দিলে নাহি মন॥" (ঘনরাম/৩৫২)

রামদাস আদকের কাব্যেও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষ্য মেলে—

"দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই ।
বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক।
ভাগ্যহীন জনার জনমে নাই সুখ॥
সম্মুখে সিপাই শোভে শমন সমান।
হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ॥"[২৪]

সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কবি প্রদত্ত চিত্রাবলীকে অযৌক্তিক বলার যৌক্তিকতা নেই; তবে অত্যাচার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য না হলেও ঘনরাম, রূপরাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী কলিযুগে যে অনাচারের চিত্র দিয়েছেন তা একেবারে অবাস্তব নয়। আবার রূপরাম পর্তুগীজ জলদস্যু বা হার্মাদের অত্যাচারের কথা বলেছেন, এর মধ্যে অবশ্যই সমকালীন ঐতিহাসিক সত্যকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ধরাই যেতে পারে দেশে সুখ-শান্তি খুব

একটা বিরাজিত ছিল না।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ ধর্মমঙ্গল যেহেতু মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের কনিষ্ঠ ধারা, তাই এখানে পরিবর্তিত যুগের অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ যুগ পরিবেশে আর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্যন্ত। তখন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক পরিবর্তিত। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিকক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার বুকে তার প্রভাব পড়েছিল। ধর্মমঙ্গলে এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছুটা পাই।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং মুদ্রার প্রচলিত নিম্নতম মান ছিল 'কড়ি'। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও ধর্মমঙ্গলে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার কথা খুব একটা পাই না। সাধারণ জনজীবনে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য, আদানপ্রদানের জন্য মুদ্রা হিসেবে কড়ি প্রচলিত ছিল। কড়ির ব্যবহার আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই। কড়া, গণ্ডা, পোণ বা পণ ইত্যাদি একক কড়ি গণনার জন্য ব্যবহার করা হত। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আমরা কড়ি বা কড়ার ব্যবহার দেখতে পাই—

"পাজ্জাত খাউই বেচে চরখা নিয়র।
পাঁচ গন্ডা বান্ধা দিল মাটিয়া পাথর॥
নাটাই মলিন সুতা অল্প দরে দিল।
চারিকড়া ধুনখাড়া নগরে বেচিল॥
আর যত সম্ভাবনা সব বেচে বুড়ী।
ঘর দ্বার বেচ্যা পাইল দশপণ কড়ি॥" (রূপরাম/১৬৩)

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যেও কড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—

"তৈল চুয়া চন্দনে ফুরাল সব কড়ি॥" (ঘনরাম/২৮৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে টাকার ব্যবহার দেখতে পাই। তখনও কাগুজে টাকার প্রচলন হয়নি, ধাতব টাকার প্রচলন ছিল—

তুষ্ট হৈল কালুবীর সেন তারপরে।
ভঞ্জিত করিয়া টাকা সুবলবাজারে॥
বসন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে।
তীক্ষ্ণধার হেতের দিলেন একে একে॥" (মানিকরাম/৩১৩)

প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার কমে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ স্বর্ণমুদ্রা যে কখনো চোখেও দেখেনি এমনি পরিচয় পাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষের বৃত্তি, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষি ঃ মধ্যযুগীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল কৃষির উপরে। বাংলার বেশীর ভাগ মানুষ কৃষি কর্মে নিযুক্ত থাকত। বাংলার ভূমির উর্বরতা শক্তি হেতু সামান্য শ্রমদানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। খাদ্যশস্য ধান ছাড়াও গম, পাট, শন, তিল, তিসি, আখ, কার্পাস, বিভিন্ন ধরনের মসলা উৎপন্ন হত। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল, পান, ফুল উৎপন্ন হত, যার উপর বাংলার মানুষ নির্ভর করত। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সঙ্গে যুক্ত রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ', এই গ্রন্থখানিতে শিবঠাকুরের কৃষিকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিত ধানের জন্মকথায় বাংলার বিভিন্ন প্রকার ধানের পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে,

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে, নাথ সাহিত্যে আমরা শিবঠাকুরের কৃষিকর্মের পরিচয় পাই। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব হত না। বিভিন্ন বৃত্তিজীবীতার পাশাপাশি ব্যবসায়, সামরিক বৃত্তি বা চাকুরী ইত্যাদির প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে চলেছিল। তবে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের স্বীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল না। রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা ডোমেরা— শূকর, গরু, মহিষ ইত্যাদি পশুপালন করত। কালুডোম ময়না যাত্রাকালে তাদের প্রতিপালিত শূকর নিতে ভোলেনি—

শাখা সুখা গোড়াইল শূকরের পাল।
কর্পূর বলেন দাদা হইল জঞ্জাল॥
ধর্মের শাসন মহী ময়নানগর।
জাতি অনুসারে ডোম নিলেক শূকর।
....
মষি গোরু দিব সভে শূকর বদলে।
ইথে আর নাহি কাজ লাউসেন বলে॥" (রূপরাম/২০৫)

মানিকরামের কাব্যেও কালু ডোমেদের শূকর পালনের প্রসঙ্গ পাই। কৃষিকার্য, পশুপালন ইত্যাদি বৃত্তি ছেড়ে মানুষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবসায়, শিল্প ও চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

বাণিজ্য ঃ মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে; একথা সকলের জানা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাণিজ্য বা ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা সমাজে প্রভাব বিস্তার করেনি। বোধহয়,'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই প্রবাদ আরও অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। সুতরাং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতি বাণিজ্য নির্ভর নয়, তবে ব্যবসা সংক্রান্ত ধারণা সমাজে গড়ে উঠেছিল। তাইতো দেখি লাউসেনের বিদেশযাত্রা এবং গৌড়েশ্বরের চাকুরী গ্রহণের কথা শুনে রঞ্জাবতী লাউসেনকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করেছে। রূপরামের কাব্যে লাউসেনের গৌড় যাত্রাকালে রঞ্জাবতী বলেছে—

"বিলাতের নামে ক্ষেম নাহি প্রয়োজন।
বেপার করিব আমি বাণিজ্যার ধন॥
লঙ্কার বাণিজ্য তোর সমুদ্রে জাহাজ।
পরধন প্রত্যাশে পরোক্ষে পাই লাজ॥" (ঐ/২১০)

লঙ্কার বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গটি এখানে সম্ভবত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল থেকে নেওয়া। এসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছিল স্থানীয় হাট বা বাজারকে কেন্দ্র করে, যেমন—মোদকরা লাড়ু নির্মাণ ও বিক্রি করত, তামলীরা পান-সুপারি বিক্রি করত, মালীরা ফুলের মালা বিক্রি করত। ফুলমালী বলেছে-

"দেবালয় দক্ষিণে বসিবে দুই ভাই।
তোমার প্রসাদে আমি ফুল বেচ্যা খাই॥
অনেক দিবস আমি গোলাহাটে আছি।
তিন সন্ধ্যা বাজারে বাজারে ফুল বেচি॥" (ঐ/১৬২)

শিল্প ঃ মঙ্গলকাব্যে কোন বৃহৎশিল্প সম্ভাবনার কথা পাওয়া যায় না, তবে গ্রামীণ ক্ষুদ্রশিল্পে, কুটীরশিল্পে বাংলা উন্নত ছিল। ধর্মমঙ্গলে অলঙ্কার শিল্প, বস্ত্রশিল্প, শঙ্খশিল্প, শোলার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কুটিরশিল্পের পরিচয় আছে। অলঙ্কার শিল্প বাংলায় কত উন্নত ছিল তার পরিচয় আছে মঙ্গলকাব্যে। তাছাড়া অলঙ্করণ শিল্প, রং-তুলির কাজ, সূঁই-সুতার কাজ করে, চরকায় সুতা কেটে, ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করে মানুষ জীবিকা অর্জন

করত। রূপরামের কাব্যে চরকায় সুতা কাটার প্রসঙ্গ পাই। শোলার কাজের কথাও পাই ধর্মমঙ্গলে, বিভিন্ন ধরনের শোলার শিল্পকর্ম দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জন করত। বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজে এক শ্রেণীর মানুষের জীবন ধারণ চলত। ছুতারগণ কাঠের কাজ করত, ডোমেরা বাঁশ ও বেতের ডালা, কুলা, ঝুড়ি বুনে বিক্রি করত, তাল পাতার চাটাই, মাদুর তৈরী করত। দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় বলেই এ সমস্ত কুটীরশিল্পের উপর আপামর সাধারণ মানুষের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ চাকুরীকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা মধ্যযুগে প্রচলিত হয়নি। চাকুরীবৃত্তি মধ্যযুগে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিন্দনীয় ছিল, তাইতো লাউসেন গৌড়েশ্বরের চাকুরী গ্রহণ করেছে একথা শুনে রঞ্জাবতী জানায়—

"তোমার বয়স হৈল আঠার বৎসর।
কার বোলে হৈলে তুমি রাজার চাকর॥ (ঐ/২১০)

সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ধারণা ছিল, কিন্তু কালু ডোমের সগর্ব উক্তি সত্ত্বেও দেখা যায় আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষ তাদের জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে জীবিকা অর্জনের নতুন পথকে স্বীকার করেছিল। লাউসেন তাই বলেছে—

"দুই ভাই গৌড়ে হব রাজার চাকর।
ইনাম মাগিয়া নিব ময়না নগর॥
মল্লবধ করিলে বাড়িল বীরপনা।
বারভুঞা হৈতে তোমার বাড়িব মাহিনা॥" (ঐ/১১৭)

চাকুরীবৃত্তিতে মাহিনা অর্থাৎ অর্থের মূল্য মানুষ খানিকটা হলেও বুঝতে পেরেছে। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই—

"মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব।
নম্র হয়ে নৃপতির চাকরি লইব॥
জাহির করিব গুণ সভার ভিতর।
লইব জাইগির করে ময়না নগর॥
আর যে নগদ মাহিনা বারমাস পাব।
দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব॥" (মানিকরাম/১৫৫)

লাউসেন বুঝতে পেরেছে নিজের সুনাম, উন্নতির জন্য, প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য অর্থ প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের ফলে আমরা দেখি ডোম সমাজ তাদের স্বীয় জাতি-বৃত্তি পরিত্যাগ করে সামরিকবৃত্তি গ্রহণ করছে। জাতিগর্বে গর্বিত হলেও তারা দেখেছে তাদের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন, পাত্রের দুর্নীতি তথা শাসকের শোষণ, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে শাসকের উদাসীনতা। তাইতো কালুর খেদোক্তি-

"অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস।
নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস॥" (ঐ/৩১০)

তাই কালুর পক্ষে লাউসেন প্রদত্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি-

"হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনাম মাহিনা দিব বাড়ার বিভব॥
বান্ধাব পুরট পাগ পরো পট্টধুতি।
দলুই সবার কানে দোলাইব মতি॥

ময়না পশ্চিমে পাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরাব পাটশাড়ী॥
কাটা কড়ি কঙ্কণ কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখ ভার॥" (ঘনরাম/৩৪৭)

মানুষের পক্ষেও এই প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বিষয়সমূহে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার আরও একটি পর্যায় দেখতে পাই 'গোলাহাট পালা'য়। এখানে দেখা যাচ্ছে নারী তাদের কুলত্যাগ করে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করছে। তারা লোকালয়ের বাইরে নিজেদের সাম্রাজ্য তৈরী করেছে। বিদেশী পুরুষকে ভুলিয়ে তারা ব্যবসা ফেঁদেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ডোমদের দারিদ্র্যময় জীবনযাপনের পাশাপাশি তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনে মোগল হারেম থেকে আগত বিলাস-ব্যসন, ব্যাভিচার সমাজে প্রবেশ করে ছিল তার সুন্দর নিদর্শন বহন করে এই প্রসঙ্গগুলি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রনৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব পড়েছিল বাঙালী সমাজে। ক্রমাগত আক্রমণকারীদের আক্রমণে রাঢ়বঙ্গের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সুগঠিত হতে পারেনি। দেশের মুষ্ঠিমেয় ধনিক শ্রেণী অর্থনৈতিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। অপরদিকে নতুন আমদানি করা বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল শাসককুল ও ধনীরা। আর সাধারণ মানুষ শাসনের নামে কর্মচারীদের দ্বারা নানা ভাবে শোষিত হত, ফলে তাদের দুর্দশার শেষ ছিল না। রূপরামের কাব্যে কালু ডোম জানিয়েছে হাটে কুলা-চেটা বিক্রি করলে তবে তাদের ভাত জোটে। মানিকরামের কাব্যে কালুডোমের উক্তিতেও তাদের দুর্দশার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন—

কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।
আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ॥" (মানিকরাম/৩১০)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় না থাকা সত্ত্বেও প্রজার দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র লিখেছেন — "প্রজাদের দুর্গতির কারণ রাজকর্মচারীর ব্যবহার। ইহা সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফল। এদিকে যেমন সামন্তেরা অধিক লোভে ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের বিশাল আড়ম্বরময় বিলাসব্যসনের অনুকরণে প্রচুর ব্যয় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ বাদশাহের দোহাই দিয়া অথবা ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়াছে।"[২৫] রূপরামের কাব্যে কালু ডোমদের এই দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যাই। লাউসেন তাদের আর্থসামজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার সময়ে নারীরাও ঘরে বসে থাকেনি, কেউ পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করেছে, কেউ দাসী বৃত্তি গ্রহণ করেছে, পথে পথে জিনিসপত্র ফেরি করেছে, মুড়ি ভেজে বিক্রয় করেছে। মানুষ অর্থের জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রয় করতে উদ্যত হয়েছে। ভাজন বুড়ির মত বৃদ্ধা যে শুধুমাত্র কাম-তাড়িত হয়েই লাউসেনকে বশীভূত করার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রি করেছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। সে বিদেশী পুরুষকে বশীভূত করে কিছুটা উপার্জনের স্বপ্ন দেখেছে। ভাজন বুড়ীর কথায় তার দারিদ্র্য সুস্পষ্ট—"মোর ভাড়া ভাঙ্গা পাথর জল খাই ভাঁড়ে।" (ঘনরাম/২৮৩)। সুতরাং মানুষ ঘটি, বাটি, চরকা, সর্বস্ব বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। জিনিসপত্রের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাইতো

ভাজন বুড়ি মালিনীকে বলেছিল—

"বুড়ী বলে বাড়া বেটী দিল বুকদাপ।
মা বাপের পুণ্যে কিছু কড়ি কর মাপ॥" (ঘনরাম/২৮৩)

সমাজে চোর ডাকাতের অত্যাচার ছিল। মানুষের নৈতিকতাবোধেও অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছিল তাই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে নানা ভাবে শোষণ-পীড়ন করত এবং চোর ডাকাতকে দিয়ে অপকর্ম করিয়ে নিত। অপরদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ নতুন নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে তার সুফল পেয়েছিল। পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে মানুষ পেল স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। কালু ডোমেরা সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। লখাই ডোমনীর উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লখাই ডোমনী কালুকে বলেছে—

"বৃত্তি বেচা ব্যবসা বিস্মৃত কেন হবে।
সেনের সম্পত্তি বিনা দানদার কবে॥
পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ়॥
মাটির পাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়েঘর।
তখন তেমন দশা এক লক্ষেশ্বর।
কখন চিনিতে তৈল তামাক তাম্বুল॥
লখে কোন না জানে নাথের আদ্যমূল॥
ঘুষিলে ছ পণ কড়ি নাই ছিল নাম।
এখন আপনি কত বিলাই ইনাম॥
বলাও দলুইরাজ কানে দোলে মতি।
তখন পড়িতে টেনা এবে পট্টধুতি॥
ভূমে হাঁটু পাতি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর॥
সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু।
সুখে খেতে খুঁদকুড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু॥
বেজার হয়েছে বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি॥" (ঐ/৬১৯)

ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ধনী জমিদাররা, রাজা মহারাজারা বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিনযাপন করত। পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর ব্যয় করত, মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার পরিধান করত. প্রচুর দান-ধ্যান করত; এই সমস্ত প্রসঙ্গগুলি এক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক।

ধর্মনীতি ঃ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় একটি প্রধান বিষয় হল ধর্ম। তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্য ধারায় যে সমাজকে পাই তা ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজ। কবিগণ ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্মকেই আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বর্ণনা করেছেন। ধর্মমঙ্গল যে সমস্ত সামাজিক অনুশাসন-ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হয়েছে তা শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম। তবে কবিগণ শাস্ত্র নির্ধারিত ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও বেদ-বহির্ভূত লৌকিক ক্রিয়াকর্মকেও প্রাধান্য দিয়েছেন. মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন রঞ্জাবতীর বিবাহ চিত্র বর্ণনায় আছে—

"বেদের বিধানে বিপ্র বাঁধে গাটছলা॥

... ...

বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব কবি সায়।
সেই রাত্রে রাজা তারে করিল বিদায়॥" (ঐ/৭৭)

পৌরাণিক তন্ত্রের প্রভাবও সাধারণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম শাস্ত্রাদির প্রভাব জনমানসে কতখানি ছিল তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি ধর্মমঙ্গল কাব্যের অভ্যন্তরে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী কখনো রামায়ণ, কখনো বা মহাভারতের আদলে গড়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত থেকে প্রচুর কাহিনী প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যে এবং তা জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মিশ্রিত রূপ পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলে। হিন্দুসমাজ কখনোই রাম ভক্ত ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু ঘনরাম স্বয়ং রামভক্ত ছিলেন। ঘনরাম ও মানিকরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও ধর্মের চাইতে হরি ভক্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন বেশী, তাই কাব্যে যত্রতত্র হরিভক্তির প্রসঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ঘনরামের কাব্যে কাব্যোৎপত্তির যে কাহিনী পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি রাম পাঁচালী লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রাম বন্দনার স্থলে ধর্ম বন্দনা লিখে ফেলায় গুরুর নির্দেশে তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। আসলে পৌরাণিক দেবীই ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে রূপান্তরিত, আবার বাঙালী সমাজের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যের ভয়ঙ্করী দেবী শান্ত মাতৃমূর্তিতে পরিণত হয়েছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তার কথা পাই।

ধর্মঠাকুর বিশেষত রাঢ়বাসীর দেবতা, ধর্মমঙ্গলে অনার্য রাঢ়বাসীর ধর্মজীবনের পরিচয় পাই। আমরা জানি ধর্মদেবতার অবয়ব তৈরীতে অনেক দেবতার অংশ চয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু এই পরিমার্জনা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই উচ্চবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুরের ঠাঁই হয়নি। অনার্য রাঢ়বাসী ডোমদের দেবতার পূজা পদ্ধতিতে, আচার-আচরণে, উপকরণে অনার্য ছাপ আছে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, ডোম, বাউরী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষরাও ধর্মদেবকে তাদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা জাতি হিসাবে শূদ্র, অন্ত্যজ— তাঁতি, শুঁড়ি, দুলে, বাগদী, রজক, মুচি, হাড়ি এরাও ধর্মদেবের ভক্ত হয়েছে। ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামক গ্রন্থে ধর্মপূজক যে সকল জাতি তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিল সেই সব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে—

"সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্ম্মকার
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥[২৬]

কালক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্ম উপাসনা প্রচারিত হয়েছিল। তাইতো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা পূজার পাশাপাশি ধর্মদেব ঠাকুরঘরেও স্থানলাভ করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এক সমন্বয় যুগের সৃষ্টি; এই সময়কার চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে সর্ব দেবদেবীর অভেদত্বের কথা পাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মঠাকুরের যে স্বরূপ ধরা পড়েছে তাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, যম, সূর্য,শিব, বুদ্ধ সকলের প্রভাব আছে। একটা সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে এরূপ সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কোথাও কোথাও শাক্ত দেবী ও শৈব দেবতার বিরোধ ধরা

পড়েছে। যেমন—

"কর্ম্মফলে হৈল যত দেবতার দণ্ডী।
অতেব ইছাই বধে খেমা দিবে চণ্ডী॥
এত শুনি কোপে জ্বলে হেমন্তের ঝি।
কোন যুক্তে তু বেটা বদনে কৈলে কি॥
ভাল বলি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মরাজে।
সবাই বিকল বটে আপনার কাজে॥
বাড়াবে আপন পূজা বধি মোর জনে।
এমন উদার কেবা আছে ত্রিভুবনে॥" (ঘনরাম/৫৩৩)

এই বর্ণনায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করেছে।অবশ্য দেবীর এই বিদ্বেষ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আসলে এই পর্বে জনমানসে ধর্মসমন্বয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। তা অবশ্য চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ফলাফল বলেও মনে করা যেতে পারে। রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন- ধর্মপূজায় কোন ভেদাভেদ থাকত না—

"ধর্মের গাজনে বাদ্য বাজে নানা ঠাঁই।
ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ চন্ডাল ভেদ নাই॥ (রূপরাম/৯৩)

কালকেতুর গুজরাট নগরে যে আদর্শ সমাজ পরিকল্পনা কবি দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, ধর্মমঙ্গলে এরকম আদর্শ সমাজ সৃষ্টির, ধর্ম ভেদাভেদহীন সমাজ পরিকল্পনার কথা পাই ঘনরামের কাব্যে। ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে 'আদ্যঢেকুর পালা'য় ইছাই ঘোষের ঢেকুরগড় স্থাপন ও জনবসতির ছবিতে আমরা অনেকটা মুকুন্দ চক্রবর্তীর গুজরাট নগরের ছবি পাই। এখানে সকল শ্রেণীর মানুষকে ধর্ম-ভেদাভেদ ভুলে আপন আপন গোষ্ঠীর সহিত নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়।এরকম ধর্ম সহিষ্ণু মনোভাব সমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়বাসীর লৌকিক ধর্মাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর পূজা সম্পর্কিত নানা ধরনের লৌকিক আচার ছাড়াও নানা ধরনের পালাপার্বণ, বার-ব্রত রাঢ়বঙ্গের বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কাব্যে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা বন্দনার.পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করেছেন, কেননা চৈতন্যদেব জনসমাজে অবতার রূপে পূজিত হয়েছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—

"কলিকাল আইল বিষম অন্ধকার।
নবদ্বীপে হও গোরাচান্দ অবতার॥"(রূপরাম/৩)

মানিকরাম গাঙ্গুলীও কাব্যে চৈতন্য-বন্দনা করেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে বিপ্র বন্দনা করেছেন। ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভাব খানিকটা খর্ব হলেও ব্রাহ্মণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তাই কবিরা ব্রাহ্মণ বন্দনা করতে ভোলেননি। ধর্মমঙ্গলে রূপরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলী দিক্ বন্দনা করেছেন। এই বন্দনা অংশগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে ধর্মভীরু বাঙালীর সহস্র-কোটি দেবতার মধ্যে বহু দেবতার পরিচয় পাই। তাদের পূজা পদ্ধতি, তাদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পাই, এবং তাদের পূজা করলে কি ফল লাভ ঘটে তার বিবরণ পাই। রূপরাম চক্রবর্তী দিক্ বন্দনায় উড়িষ্যার জগন্নাথদেব, কাশীর বিশ্বেশ্বর, গয়ার গদাধর,

গঙ্গাসাগর তীর্থ, অযোধ্যার রামসীতা, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ. নদীয়ার চৈতন্য বন্দনা করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই এগুলি বাঙালী হিন্দুর তীর্থস্থানে পরিণত। আর যে সমস্ত দেবতার বন্দনা করা হয়েছে সেগুলি গ্রামদেবতা, লৌকিক দেবতা। কবি ভগবতী বন্দনা করেছেন, কিয়া পাতে কেতকা সুন্দরী মনসা বন্দনা করেছেন। তাছাড়াও বালিডাঙ্গার সর্বমঙ্গলা, কোতলপুরের বিশাললোচনী, বঞ্চিতালের ঝকরাই, শিওড়ের শান্তিনাথ, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, রাজবল হাটের শ্রীরাজবল্লভী, অম্বুয়ার ঘাটে কালিকা, ময়নাপুরের ষষ্ঠীদেবী, যুঝাটির ধর্মঠাকুর, জারগ্রামের কালুরায়, গবপুরের স্বরূপনারায়ণ ও কাঁকড়া বিছে. সেনপুরের বাঁকুড়া রায়, শালেপুরের যাত্রাসিদ্ধি রায়, কাইতির বাণরাজার পাট, বালিপোতার শ্বেতগঙ্গার ঘাট, সেহাখোলার উত্তরবাহিনী, ধারুয়ার দেবী, জয়ন্তীপুরের সর্বমঙ্গলা, তালপুরের ষষ্ঠীবুড়ী, লাউগ্রামের দন্ডেশ্বরী, গোতানের বটেশ্বরী, পলাসনের অগ্নিমুখা হর ও তাড়েশ্বর শিব, শ্রীরামপুরের মহিষমর্দিনী, নেউরের লাল, বেতায়ের সর্বমঙ্গলা, মৌলার রঙ্কিণী, কালিঘাটের কালী, আমতার মেলাই, খেপুতের খেপায়, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর ,বিজয়া নগরের কমলা, সোনাটিকরির বিষহরি, জোড়ুতের ভগবতী, আহিলার রঙ্কিনী, ধাতনাই এর সারদাঠাকুরানী, কায়ালপুরের চন্দ্রমুখী, তমলুকের বর্গভীমা, পুড়মের ঘাঁটু, কামার হাটির পঞ্চানন্দ, মান্দারন গড়ের পীর ইসলামি, রিসিবাটী গাঁয়ের বড়খাঁ গাজী, পেঁড়োর শুভিখাঁ, ত্রিবেণীর দফরখাঁ গাজী ও ষোলকাজী, দর‍্যার পীর কালুরায় এবং শেষে কবি পিতামাতা ও গুরু বন্দনা করেছেন। (রূপরাম/৫-৬)

মানিকরামের কাব্যে কিছু অতি প্রাচীন দেবস্থান ও দেবতা ছাড়া প্রায় সকলেই লৌকিক ও নবীন দেবদেবী। মনে হয় রূপরামের কাব্যে যে সমস্ত দেবদেবীর কথা নেই সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি হতে পারে নতুবা রূপরাম কাব্যে তাদের কথা উল্লেখ করতেন। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে যে সমস্ত নতুন দেব-দেবীর বন্দনা আছে সে গুলি হল-—বেলডিহার বাঁকুড়া রায় ও শীতল সিংহ, কুলুয়ের ফতে সিংহ, বৈতালের বাঁকুড়া রায়, পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম, শ্যামবাজারের দলু রায়, দেপুরের জগৎ রায়, গোপালপুরের কাঁকড়া বিছা, সিয়াসের কালাচাঁদ, ইঁদাসের বাঁকুড়া রায়, মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ. বরুজগ্রামের মোহন রায়, গুরুচের শীতলনারায়ণ, আলগুচিনার ক্ষুদি রায়, আকুটিকুলেমালার ধর্ম, বন্দিপুরের শ্যাম রায়. যাজপুরের দেবগৃহ, তারাহাটের তারকেশ্বর, ফুলুয়ের ফুলেশ্বর দোলেশ্বর, কামেশ্বরের নেড়া দেউল, ব্রাহ্মণ ভূমের ঝাড়েশ্বর, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর, বেতায়ের কোঙরেশ্বর, ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর, খানাকুলের ঘন্টেশ্বর, বালিগড়্যার অরকেশ্বর, কাশীর কাশীশ্বর ,বগড়ির কৃষ্ণ রায়, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, দ্বারিকার দ্বারিকানাথ, সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ. পাণ্ডুগ্রামের শ্যামচাঁদ, ধুলেপুরের কেলেসোনা, বাগনাপাড়ার বলরাম, কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ, তমলুকের জিষ্ণুহরি, বোড়র বলরাম, যাজপুরের রাধাশ্যাম, মাহেশের জগন্নাথ, চন্দ্রকোণার রঘুনাথ. অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বালসীর নারায়ণ, কাটোয়ার চৈতন্য ও নিতাই, কামারহাটি, দেশড়া ও পড়াশের পঞ্চানন, ভিতরগড়ের সত্যপীর, মনাইচকের ও মিলিকির মোকাম, ফুলুয়ের জয়দুর্গা, কালীঘাটের কালী, মৌলার রঙ্কিণী. বিক্রমপুরের বিশালা, বড়দার বিশালা. সিয়াখালা এবং বন্দীপুরের বাসুলী. বেতায়ের সর্বমঙ্গলা, কামরূপের কামাখ্যা. হিংগুলাটের হিংগুলাটেশ্বরী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যাচলবাসিনী, পুরুষোত্তমের বিমলা, কাশীর অন্নপূর্ণা. ঢাকার ঢাকেশ্বরী. আরুড়ের অপর্ণা, কিরীটিকাণার কিরীটিশ্বরী, যাজগ্রামের বিরজা, আশ্বিনকোটার অষ্টভূজা. সেনপাহিড়ের শ্যামরূপা. খাতড়ার মহাকালী, পড়াশের ঘাঁটু. নাচড়ের শ্রীসর্বমঙ্গলা. আনুড়ের বিশালা. মড়াগড়্যার বাণেশ্বরী. লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী. লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী. বুঞাত্রের চণ্ডী, রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী, মানসপুরের মনসা, ছিরামপুরের ত্রিপুরাসুন্দরী. বেলার চণ্ডী. ছাতনার বাসুলী. রায়খাঁর কালী,শনিঘাটের শুভা.শাটীনন্দীর লক্ষ্মী, পলাশীর পলাশচণ্ডীকা, ভাঁড়ারগড়ের ভাড়াচণ্ডী.

খীরগ্রামের নৃমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামের ভগবতী, এ সমস্ত দেবদেবীকে নতি জানিয়েছেন মানিকরাম। প্রাচীন দেবতার স্থলে নতুন দেবতার সৃষ্টি ইতিহাসে নতুন নয়। মানিকরামের দিগ্‌বন্দনায় অনেক জায়গায় দুজন দেবতার কথা আছে, বোধ হয় ঐ দেবতারা সকলেই একই অঞ্চলে সমান প্রসিদ্ধ ছিল। আবার রূপরামের কাব্যে অভিনব বিষয় ফকির, গাজী, পীর, কাজী বন্দনা। এর মধ্যে দিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ধরা পড়েছে। কখনো বা একই দেবতা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে পূজিত হত। এতে ধর্মঠাকুরের নামান্তর পাচ্ছি, যেমন- — শীতল সিংহ, ফতে সিংহ, যাত্রাসিদ্ধি, দলু রায় মোহন রায়,শ্যাম রায়, কৃষ্ণ রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি, সুতরাং সমকালীন গ্রামীণ সমাজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই দিগ্‌বন্দনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কতটা ছিল তা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, ঘনরামের কাব্যে আমরা দেখি জামতি পালায় সুরিক্ষার ছ'কুড়ি নাগরদের যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বেশীর ভাগ নামই বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণের নামের প্রতিশব্দ; আমরা নামগুলির মোটামুটি তালিকা উল্লেখ করতে পারি,যেমন— কল্যাণ, কুশল, কৃষ্ণ, কেশর, কিঙ্কর, ক্ষেমানন্দ, নগেন্দ্র, খগেশ্বর, গঙ্গাধর, গোবিন্দ, গঙ্গেশ, গঙ্গারাম, ঘনরাম, ঘসীরাম, ঘনশ্যাম, চতুর্ভূজ, চণ্ডীচরণ, চম্পতি, চন্দ্রচূড়, চৈতন্যচরণ, দুখুরাম, ছ'কড়ি, ঈশ্বর, ঈশ্বরীদাস, জানকী রাম, হরিজীবন, ইন্দ্রনারায়ণ, অকিঞ্চন, অনন্ত, অচ্যুত, অভিরাম, দৈবকীনন্দন, দুর্গাদাস, শুভারাম, তুলসী, তিলক, তুলারাম, অর্জুন, অযোধ্যারাম, অদিতি, চক্রপাণি, ভীমরায়, ভরত, ভাবিনী, মুরারী, মাধব, মধুসূদন, মুকুন্দ ইত্যাদি। নামগুলির বেশীর ভাগই বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত, তাছাড়া শিবঠাকুর ও মনসা সম্পর্কিত নামকরণ ছাড়াও দু'-একটি নামকরণ সাধারণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম তৎকালেও সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা পরিষ্কার করে বোঝায় যায় এই নামকরণগুলি থেকে।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬১৯।

২। ঐ , পৃঃ ৬২১।

৩। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৩।

৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭০২।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬২১।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১২২।

৭। ঐ, পৃঃ ১২১।

৮। ঐ, পৃঃ ১২২।

৯। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৯।

১০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৩০।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৭।

১২। ঐ, পৃঃ ১৩৩।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৪১।

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ১৩৪।

১৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৫৩।

১৬। মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা অংশ, আলোচনা- ৫, বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত।

১৭। ঐ।

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ১৬২।

১৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ৭৩৬।

২০। শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিত, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ.: ৪।

২১। ঐ, পৃ. :১২-১৩।

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১১৪।

২৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭১২।

২৪। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ১২৮ থেকে তথ্যটি প্রাপ্ত।

২৫। ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকা অংশ, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত।

২৬। শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিত, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪৪।